৪৩বর্ষ • ২য় সংখ্যা • এপ্রিল-জুন ২০২৩

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
গরমিল	সজনীকান্ত সেন	২
অমর্ত্য বিদূষণ	আশীষ লাহিড়ী	৩
দেবস্থানে সাবধান	প্রদীপ চক্রবর্তী	৬
করে দেখো ভালো লাগবে	শুভেন্দু দাশগুপ্ত	১০
ব্যক্তি ধীরেন্দ্রনাথ	সমীরকুমার ঘোষ	১২
মৃত্যুর সময় এবং শংসাপত্র	ভবানীপ্রসাদ সাহু	১৫
স্বচিকিৎসা (১০)	গৌতম মিস্ত্রী	১৯
মিক্সচার জমানা	অরুণালোক ভট্টাচার্য	২৩
রাজস্থানের উটের কথা	নিরঞ্জন হালদার	২৫
হোমিওপ্যাথি গবেষণা	সুব্রত রায়	২৬
বিপন্ন একুশ শতক	শ্যামল ভদ্র	২৮
চিঠিপত্র		৩০
পত্রিকা পর্যালোচনা		৩১
বইমেলার প্রতিবেদন		৩২

রেজিস্টার্ড অফিস : বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক, কলকাতা- ৬৪

কার্যালয়

খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন

বি ৪, এস - ৩, নারায়ণপুর

পোঃ (আর গোপালপুর) কলকাতা- ৭০০১৩৬

ফোন : ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৮৯০২৪১২২৯০/৮৭৭০৬৬৪৭২

ওয়েবসাইট : www.utsomanush.com/ই - মেল : utsamanush1980@gmail.com/ফেসবুক : http://www.facebook.com/utsomanush/

ISSN 0971-5800/RN.37375/80

প্রাক-কথন

একএক সময় *উৎস মানুষ* পত্রিকার আগের সংখ্যাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে গিয়ে কিছু নিবন্ধ ও সম্পাদকীয়তে চোখ আটকে যায়। মনেই হয় না যে সেগুলি অত আগের লেখা। আজকের সামাজিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে বড়ই প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তেমনিই একটি সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল পত্রিকার জানুয়ারি ১৯৮১ সংখ্যায়। আমাদের অকাল প্রয়াত সম্পাদক অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর অনবদ্য প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা সম্পাদকীয়টি পেয়ে আমরা আর এই সংখ্যার জন্য নতুন করে 'আমাদের কথা' লেখার তাগিদ অনুভব করিনি।

আমাদের কথা

তত্র ভেরী সহস্রাণি শঙ্খনামযুতানি চ
বাদয়ন্তি স্ম সংহৃষ্টা সহস্রাযুতশো নরাঃ।।
(মহাভারত, উদ্যোগ পর্ব)

ঠিক এক বছর আগে এই বিষাণবাদ্যে আমাদের পথচলা শুরু হয়েছিলো। যাত্রাপথ সেই রণক্ষেত্রে যেখানে মানুষে গড়া সমাজে প্রত্যহ চলে বেঁচে থাকার লড়াই। যাত্রাপথ সেই তীর্থক্ষেত্রে যেখানে যাবতীয় ইষ্ট-অনিষ্টের মূলে মানুষ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের উৎশক্তি মানুষ।

আমাদের বক্তব্য, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয় নি, হবার নয়। বরং যাত্রাপথের একটি প্রস্তর-ফলক পার হয়ে এসে অনেক সহযোগী কর্মী, সহমর্মী বন্ধু এবং সহানুভূতিশীল পাঠকদের সাথে ঘনিষ্ঠতর হতে পেরেছি, এতে আমাদের ভাবনার ওপর আস্থা বেড়েছে। তাই আমাদের সেই প্রাথমিক আত্মপরিচয়ের কথারই পুনরাবৃত্তি করতে চাই, যে কথা অপেক্ষাকৃত নতুন বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় নি।

এই মুহূর্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যাপক প্রয়োগ নিয়ে সারা পৃথিবী সক্রিয়। ছোটবড় রাষ্ট্রশক্তিগুলির মধ্যে সাড়ম্বর বিজ্ঞানচর্চার উন্মত্ত প্রতিযোগিতা চলছে। কিন্তু সে তুলনায় বিশ্বজুড়ে সাধারণ মানুষের সামাজিক চেতনা, মানবিক বোধ আর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কাজে 'বিজ্ঞানে'র

ভূমিকা কি? বলা যায়—নিষ্ফলা, বন্ধ্যা। তা না হ'লে এই বিংশ শতাব্দীর আটের দশকে এসে কেন শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে অধিকাংশ মানুষ কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, অদৃষ্টবাদ আর অতীন্দ্রিয়বাদের শিকার হয়? (এবারের গঙ্গাসাগর মেলার বীভৎস আত্ম-নির্যাতনের অকথ্য ভীড়-ভাট্টায় সেই ভদ্রলোককেও দেখা গেল যিনি কলকাতার দৈনন্দিন ভীড়কে জানোয়ারের খোঁয়াড় ব'লে দু'বেলা গাল দিচ্ছেন।) প্ল্যানচেট, জন্মান্তরবাদ, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক কেন অনায়াসে বিশ্বাস করি আমরা কোনরকম যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই? কোন্ বৈজ্ঞানিক কারণে বহুডিগ্রীধারী বিজ্ঞানীও পলা নীলা পোখরাজ কবচ তাবিজ ধারণ করেন? ভুঁইফোড় 'বাবা'দের ভেল্কীবাজী আর চতুর ক্রিয়াকলাপের প্রতি অন্ধভক্তিকে মূলধন ক'রে কত প্রতারণা ভণ্ডামি যৌনাচার আর নৈতিক অধঃপতনের রাস্তা পরিষ্কার হয়, দেখা যায় সর্বত্র, তবুও তাদের প্রভাব বাড়ে বই কমে না কেন? প্রকৃতির বুকে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন কি কৌশলে হয়ে যায় 'গ্রহান্তরের আগন্তুকে'র স্বাক্ষর! ...এ সবেরই মূলে আছে সেই মূঢ় বিশ্বাস আর অন্ধ গ্রহণীয়তার ক্লেদ যাকে তাড়িয়ে ব্যক্তিমানুষের সংস্কৃতিবোধকে মুক্ত পরিচ্ছন্ন করার দায়িত্ব বিজ্ঞান পালন করেনি—যদিও রাষ্ট্রশক্তির শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে প্রচুর কিংবা জনপ্রিয় বিজ্ঞানের নামে ব্যবসায়ী হুজুগ তুলেছে কোথাও কোথাও। সমস্ত বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানসেবীর পবিত্র সামাজিক দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অধিকাংশের নির্লজ্জ পলায়নী প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় আজ অতি দুঃখের সাথে।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের এক একটি আত্মকেন্দ্রিক যন্ত্র তৈরী করে। সমাজ নিয়ন্ত্রক ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী শাসন-শোষণের স্বার্থে কুসংস্কার, ভাগ্য আর দৈবনির্ভরতাকে নানা কৌশলে জিইয়ে রাখে। আর এরই কারণে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ব্যক্তিত্ব আত্মবিশ্বাস এবং অন্যান্য মানবিক গুণাবলী সুস্থভাবে গড়ে ওঠে না, জন্ম নেয় সংকীর্ণতা দুর্বলতা বিদ্বেষ আর অসংহতি। ...এই অন্তর্লীন ভয়াবহ রোগসংক্রমণের অবসান ঘটবে আমূল সামাজিক পরিবর্তনে। কিন্তু এর জন্য যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রয়োজন তার প্রধান অন্তরায় হ'ল ব্যক্তিমানুষের অসুস্থ অবৈজ্ঞানিক বোধ। তাই ব্যাপক বিজ্ঞান-আন্দোলন চাই যা মানুষের ঝিমিয়ে পড়া চেতনাকে সজাগ করবে। এ এক যুদ্ধ। অতি দুরূহ দীর্ঘমেয়াদী পবিত্র যুদ্ধ। আমাদের পত্রিকার বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর নড়বে না কিংবা আত্মকেন্দ্রিকতা ও অনাচারের অবসানে স্বপ্নের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে না, আমরা জানি। কিন্তু বৃহৎ কর্মযজ্ঞে আমাদের গণ্ডূষপ্রমাণ আহুতিটুকু রাখতে চাই, অসংগঠিত বিজ্ঞানকর্মী ও সচেতন মানুষেরা বৈজ্ঞানিক ভাবনার সূত্রে একত্রিত হতে চাই। গত একবছরের অভিজ্ঞতায় এই সহমর্মিতার ছোঁয়া আমরা পেয়েছি বেশ কিছু পত্র-পত্রিকা ও প্রগতিশীল সংগঠনের কাছ থেকে। তাই প্রত্যাশা রাখার জোর পাই—এই পত্রিকার বিকাশ হবে পুরনো-নতুন পাঠকদের আন্তরিক সহযোগিতায় যাঁরা এর বিকাশ ঘটানোকে প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করছেন।

উ মা

গরমিল

শ্রী সজনীকান্ত দাস

জাতিভেদ আর অস্পৃশ্যতা এ দু'য়ের সীমারেখা,
হাঁড়িতে ভাতের, জলের ঘটিতে খুঁজি,
নাসিকা কোথাও কুঞ্চিত হয়ে লেখে 'বর্ণের' লেখা,
'রাম রাম' বুলি মাত্র কাহারও পুঁজি।
বেজাত, জাতের মধ্যে রয়েছে জন্ম যুগের বাধা,
গলায় পৈতা বাহিরে প্রকাশ তার,
মন্ত্রের বলে মহাত্মা যদি কালোরে করেন সাদা,
চৌথ আদায় তবু হবে দেবতার!
ধুয়ে ধুয়ে জলে কয়লার মলা জলেরে মলিন করে—
রীতির প্রভাব সকল নীতির সেরা।

রসনা খুঁজিছে বাসনা-বিলাস গোপনে রান্নাঘরে,
রূপা আর সোনা শুদ্ধ রাখিছে ডেরা।
পথের ধূলায় মানব-ধর্ম্ম যাইতেছে গড়াগড়ি'
রেখেছে তুলিয়া আচার ধর্ম্ম তাক্-এ,
খাওয়া শোওয়া বসা এবং বিবাহ লয়ে যত লড়ালড়ি,
রসের বেসাতি তবু হয় তারো ফাঁকে।
অস্পৃশ্যতা দূর কর, আর রাখ রাখ জাতিভেদ,
বধ কর তবু বলির মন্ত্র পড়,
দাস যতদিন রবে ততদিন চলিবে এ নরমেধ,
নরের ধর্ম্ম মানুষের চেয়ে বড়।

বাংলা ১৩৩৯ সালে 'রূপরেখা' পত্রিকার ১ম বর্ষ সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। দুই বাংলা ও তার সাংস্কৃতিক মিলন ঘটানোই ছিল পত্রিকাটির উদ্দেশ্য। সম্পাদক ছিলেন জাহান আরা চৌধুরী। উ মা

অমর্ত্য সেন এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বিষয়কে নিয়ে যে বিতর্ক তা সংবাদ মাধ্যম ও সোশ্যাল নেটওয়ার্কে বেশ চর্চিত বিষয়। আমাদের মনে হয় অমর্ত্য সেন ভারতবর্ষের বাইরে যে সম্মান ও সহযোগিতা পেয়েছেন তার সামান্যই দেশের মানুষ তাঁকে দিতে পেরেছে। শুধু তাই নয় আমাদের রাজ্যে বাম মনোভাবাপন্ন মানুষজনও আশ্চর্যজনকভাবে নীরব, কিন্তু কেন? তার খানিকটা উত্তর তেইশ বছর আগে উৎস মানুষ পত্রিকার মার্চ ১৯৯৯ সংখ্যায় প্রকাশিত আশীষ লাহিড়ী-র নিবন্ধ — 'অমর্ত্য-বিদূষণ : একটি পোস্ট মর্টেম' আজও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক— তাই পত্রিকার এই সংখ্যায় পুনর্মুদ্রণ নতুন পাঠকদের কথা ভেবে। — স.ম.

অমর্ত্য-বিদূষণ

একটি পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট

আশীষ লাহিড়ী

অমর্ত্য সেনের নোবেল পাওয়ার ঘটনাটা বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মসম্মান খুঁজে পাওয়া। আমরা তাহলে শুধুই চোর, ভিখারি আর কুষ্ঠরোগীর জাত নই! তথাপি বিরূপ সমালোচনা উঠছে মাঝে মধ্যে। প্রশ্ন ওঠে খোদ নোবেল প্রাইজের চরিত্রকে কেন্দ্র করে। এই প্রাইজ যেহেতু বহুবার সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, হচ্ছে, অতএব অমর্ত্য সেন আসলে সাম্রাজ্যবাদের পেটোয়া লোক— সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির স্বার্থেই নাকি তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া। ...অথচ খোদ সাম্রাজ্যবাদী মহলেই অমর্ত্যের জনকল্যাণ অর্থনীতি নিয়ে প্রচুর আপত্তি উঠেছে। তাহলে রহস্যটা কী? আসলে অমর্ত্যের বিরুদ্ধে ওই অভিযোগগুলি বিভিন্ন ধরনের লোকের বিভিন্ন রকম প্রত্যাশার ও ব্যর্থ আশার অভিব্যক্তি মাত্র! নিজেদের পুরনো ধ্যানধারণাগুলোকে নতুন তথ্যের আলোকে যাচিয়ে নেবার কোনো তাগিদ এঁদের নেই। কোনো মৌলবাদীরই থাকে না।

মাদার টেরিসা এবং ডমিনিক লাপিয়েরের অক্লান্ত পরিশ্রমে কলকাতা সারা পৃথিবীর সবচেয়ে দর্শনীয় ভিখারিস্থান বলে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সম্প্রতি খাস বিলেতের এক সাহেব কলকাতায় এসে বাঙালিদের টেরিসা ও লাপিয়ের-ভক্তি দেখে থ। স্টেট্‌সম্যান পত্রিকায় এক চিঠি লিখে তিনি বলেন যে বাঙালিদের যদি এতটুকু আত্মসম্মানের বোধ থাকত, তাহলে তারা এই দুই ব্যক্তিকে নিয়ে এত নাচানাচি করত না।

এহেন অবস্থায় এক বাঙালি অর্থনীতিবিদ যখন সত্যিই অবশেষে নোবেল প্রাইজটা পেলেন, তখন কলকাতার অভাব-মূর্তিটা একটু বদলে গেল। খুব মাথাঠাণ্ডা লোককেও দেখলাম আনন্দে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে। এই বাজারেও কলকাতার লেখাপড়া-করা বাঙালি তাহলে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে! আমরা তাহলে শুধুই চোর, ভিখারি আর কুষ্ঠরোগীর জাত নই! অমর্ত্য সেনের নোবেল-বিভূষিত হওয়ার ঘটনাটা বাঙালি মধ্যবিত্তের আত্মসম্মান খুঁজে পাওয়ার প্রয়াসের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। ফলে অমর্ত্য সেন মানুষটি কেমন, কী তাঁর ভাবনাচিন্তা, সে বিচার শিকেয় তুলে বাঙালি মধ্যবিত্ত তার অনেক দিনের শূন্যতা নিমেষের মধ্যে ভরে নিতে চাইল স্রেফ ভাবাবেগ দিয়ে।

অথচ অমর্ত্যবাবু যে ধরনের মূল্যবোধে বিশ্বাসী, সমস্ত রকম ধর্মকর্ম সম্বন্ধে তাঁর যেরকম সুস্পষ্ট অনীহা, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর যে-আপোষহীন মনোভাব, নারী-পুরুষের সম্পর্ককে তিনি যেরকম খোলা মনে বিচার করেন, বহুত্ববাদী রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর যে দ্বিধাহীন পক্ষপাত, যে কোনোরকম একদলীয় শাসনের প্রতি তাঁর যে তীব্র বিরাগ, মাও সে তুঙের জীবদ্দশায় চীনের বীভৎস দুর্ভিক্ষের প্রতি বারবার অঙ্গুলিনির্দেশ করে যেভাবে তিনি বামপন্থীদের অপ্রস্তুত করেন—সে সম্পর্কে এতটুকু ধারণা থাকলে তাঁর বিভিন্ন মহলের ভক্তসংখ্যা যে বিচ্ছিরিভাবে কমে যেত, তাতে সন্দেহ নেই। সত্যি কথাটা হচ্ছে এই যে অমর্ত্যবাবু শিক্ষিত বাঙালিদের চেনা ছকের থেকে একেবারেই আলাদা গোত্রের মানুষ।

যে কোনো বড় মাপের বাঙালি সম্পর্কেই অবশ্য কথাটা প্রযোজ্য। অমর্ত্যবাবুর আগে যে বাঙালিটি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাঁকেও কোনোদিনই ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি বাঙালিরা। তিনি নোবেল পুরস্কার পাবার পর ভাবের বুদ্বুদে গদগদ একদল বাঙালি কলকাতা থেকে স্পেশাল ট্রেনে করে শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন তাঁকে 'অভিনন্দন' জানাবার

জন্যে। তার উত্তরে, জীবনে একবার অসৌজন্য প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন, 'আপনাদের দেওয়া এই সম্মানের মদিরা আমি ওষ্ঠে স্পর্শ করলাম, অন্তরে গ্রহণ করতে পারলাম না।'

অমর্ত্য সেনের যে ভাবমূর্তি তৈরি করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাইছে বাঙালি মধ্যবিত্ত, তার সঙ্গে বাস্তবের অমর্ত্যের বিশেষ মিল নেই। অমর্ত্য সেনের সঙ্গে বরং মিল খুঁজে পাওয়া যায় তিরিশ-চল্লিশ দশকের লিবারাল ব্রিটিশ বুদ্ধিজীবীদের। তাঁদেরই মতো সুভদ্র তিনি, মার্জিত, সূক্ষ্ম রসবোধে সুস্মিত। ব্যাপক জনগণের সঙ্গে মেলামেশায় খুব একটা স্বস্তি বোধ করেন না। সারস্বত জগতে সম্মানিত, এবং সম্মান-সচেতন। চিন্তাভাবনায় বিশ্বজনীন, মানবদরদী, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে মরণপণ জেহাদ ঘোষণায় অনাগ্রহী। তিনি বোঝেন কাজ। নিজের কাজটাকে একেবারে নিখুঁত করে তোলার মধ্যে দিয়েই তিনি নিজের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালন করতে চান। অপ্রতিরোধ্যরূপে নাস্তিক তিনি, কিন্তু অন্যের ধর্মাচরণের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। মার্কসের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল, এমনকি দিল্লি স্কুল অব ইকনমিক্সে 'মার্কস ক্লাবে'র উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু মার্কসবাদী নন। প্রখরভাবে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, এবং বৈরাগ্যসাধনে নিতান্ত বিমুখ (কেমব্রিজের বাড়িতে তাঁর মদ্যভাণ্ডারের উৎকর্ষ নাকি উল্লেখযোগ্য)। তিনি অতি বিনয়ী নন, দুর্বলচিত্ত নন, আর্থিক ও অন্যান্য জাগতিক ব্যাপারে মোটেই উদাসীন নন, আবার দেখনদারিতেও তাঁর ঘোর আপত্তি। রাজনীতির প্যাঁচ-পয়জার ভালোই বোঝেন, তাই ওপথ মাড়ান না। এবং সর্বোপরি বিপ্লবী নন, নিজেকে শহিদ বানানোয় তাঁর কোনো আগ্রহ নেই।

এহেন একজন মানুষকে বাঙালিরা দরিদ্র-বান্ধব, অবলাবান্ধব, বামবান্ধব, বাঙালিবান্ধব, বাংলা ভাষাবান্ধব, পশ্চি বাংলা-বান্ধব, বাংলাদেশ-বান্ধব ইত্যাদি ভেবে নিয়ে স্তুতি করতে লাগল। ফলে যা ঘটবার তাই ঘটল। জাগলো বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। প্রথম প্রশ্ন উঠল খোদ নোবেল প্রাইজেরই চরিত্র নিয়ে। ঐ প্রাইজ যে বহুবার সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি ও রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অযোগ্যের হাতে অর্পিত হয়েছে, সেই নজির টেনে কেউ কেউ বললেন, অমর্ত্য সেন আসলে সাম্রাজ্যবাদের পেটোয়া লোক। সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতি যাতে আরও সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে, তারই পথ বাতলে দিচ্ছেন তিনি। তাই এই পুরস্কার। যাঁরা এসব কথা বলছেন তাঁদের আগে প্রমাণ করতে হবে যে অমর্ত্য সেন ঠিক কোন কোন কাজ করে সাম্রাজ্যবাদের সেবা করছেন। অন্যথায়, নোবেল প্রাইজ সাম্রাজ্যবাদী অনুমোদন, নিছক এই সমীকরণ আউড়ে তাঁকে দালাল বলে দেওয়াটা অবরোহবাদী যুক্তিপ্রাণীর নিখুঁত নিদর্শন হিসেবে লজিকের বইতে স্থান পাবে। ঐ যুক্তিতে ফ্লেমিং, পাউলিং কিংবা আইনস্টাইনও তো সাম্রাজ্যবাদের দালাল।

অথচ খোদ সাম্রাজ্যবাদী মহলেই অমর্ত্যের জনকল্যাণ-অর্থনীতি নিয়ে প্রচুর আপত্তি উঠেছে। তাদের একাংশ প্রকাশ্যেই বলছে, এবারের অর্থনীতির নোবেল প্রাইজ 'ভুল লোকের হাতে গিয়ে পড়েছে'। এই অভিযোগেরই জের টেনে এদেশেও কথা উঠেছে যে, সবে যখন বাজারি অর্থনীতির পশ্চিমা হাওয়া ভারতে বইতে শুরু করেছে, ঠিক তখনই প্রাথমিক স্বাস্থ্য আর শিক্ষার মতো ছেঁদো জিনিসের পেছনে সরকারকে টাকা বিনিয়োগ করতে প্ররোচিত করে অমর্ত্যের নোবেলপ্রাপ্তি নাকি ভারতের 'মুক্তি'কে বহু বছর পিছিয়ে দেবে।

ওদিকে, প্রাথমিক শিক্ষাপ্রসারের সঙ্গে হিন্দুত্বের সম্পর্কটা যে সাপ আর নেউলের মতো, তারই প্রমাণ দিয়ে সঙ্ঘ-পরিবারের রামভক্তেরা কিচিমিচি আওয়াজ তুললেন, এ প্রাইজ আসলে 'কেরেস্তানি' বদমাইশি, অবোধ ও কোমলমতি হিন্দুদের জাত মারবার চক্রান্ত। শুধু এই প্রতিক্রিয়াটুকু জাগানোর জন্যই অমর্ত্যবাবুর নোবেল পুরস্কার পাওয়া দরকার ছিল।

অভিযোগগুলোকে যদি সাজাই, তাহলে দাঁড়ায় এইরকম ঃ (১) **অমর্ত্য সেন সাম্রাজ্যবাদের সেবক**, যেহেতু তিনি পুঁজিতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই মানুষের অবস্থার উন্নতির কথা বলেন, পুঁজিতন্ত্রের ধ্বংস কামনা করেন না। (২) **অমর্ত্য সেন সাম্রাজ্যবাদী বাজারি অর্থনীতির সর্বনাশ করতে চাইছেন**, যেহেতু তিনি মানবকল্যাণের জন্য সরকারকে বিনিয়োগ করতে বলছেন, যেহেতু তিনি বেসরকারি পুঁজির হাতে-গরম মুনাফা অর্জনকেই মনুষ্যত্বের চরম মোক্ষ বলে মানেন না। (৩) ব্যক্তি মানুষের স্বাধীনতাকে তিনি সর্বোচ্চ মূল্য দেন, অথচ এই স্বাধীনতার সপক্ষে সাক্ষী মানেন **কার্ল মার্কস-কে**, যিনি সাম্রাজ্যবাদীদের চোখে সকল স্বাধীনতার অপহারক রূপে ধিক্কৃত। (৪) শিক্ষায় ও স্বাস্থ্যে চীনের অভাবনীয় উন্নতি সম্পর্কে তিনি উচ্ছসিত, সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই **বামপন্থী**। (৫) চীনপন্থীরা যে সত্যটাকে এই সেদিন পর্যন্ত অস্বীকার করতেন, সেটা নিয়ে বড্ড বেশি নাড়াচাড়া

করছেন তিনি। পঞ্চাশের দশকে চীনের মর্মান্তিক দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ হিসেবে তিনি সে দেশের গণতন্ত্রহীনতাকে চিহ্নিত করেছেন। সাদা বাংলায়, লক্ষ লক্ষ লোকের খেতে না পাওয়ার খবর স্রেফ চেপে যাওয়া হয়েছিল, যেহেতু ঐ বিশাল দেশের প্রচারমাধ্যম পুরোপুরি সরকার-কবলিত। অথচ ভারত অন্য সব ক্ষেত্রে চীনের থেকে যতই পেছিয়ে থাক, এখানে অত বড় দুর্ভিক্ষ যে হয়নি, এটা তো ঘটনা। সেন বলেন, সেটা ভারতের এই নড়বড়ে, বিকলাঙ্গ, আধাখেচড়া গণতন্ত্রেরই কল্যাণে। অর্থাৎ তাঁর মতে ব্যর্থতা কেবল চৈনিক অর্থনীতিরই নয়, **ব্যর্থতা খোদ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার। সুতরাং সেন মহাশয় কখনোই বামপন্থী হতে পারেন না।** (৬) নাক-উঁচু 'উত্তরাধুনিক' বুদ্ধিজীবীদের মতো তিনি **সাবেকি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে হেলাফেলা করেন না**, অথচ ভারতীয় সভ্যতার তথাকথিত 'বিশেষ' **আধ্যাত্মিক চরিত্র সম্পর্কে জাতীয়তাবাদীদের ব্যাখ্যায় তাঁর ঘোর আপত্তি।** তিনি বলেন, ঐ জিনিস মাথায় সেঁধোলে আধুনিক বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির পুরো ফায়দা তোলার ক্ষমতাটাই নষ্ট হয়ে যায়।

স্পষ্টতই, অভিযোগগুলো পরস্পর-বিরোধী। অথচ তথ্যগুলো কিন্তু একটাও মিথ্যে নয়। তাহলে রহস্যটা কী? আসলে ঐ 'অভিযোগ'গুলো অভিযোগ নয়, বিভিন্ন ধরনের লোকের বিভিন্ন রকম প্রত্যাশার ও ব্যর্থ আশার অভিব্যক্তি মাত্র। যেমন ধরা যাক মৌলবাদী কমিউনিস্টদের কথা। লেনিন যাকে বলেছেন 'Concrete analysis of the concrete situation', সেটা এঁরা কখনোই করেন না। এঁদের আশা ছিল, কোনো এক শুভলগ্নে আকাশ থেকে টুপ করে নেমে আসবে সমাজতন্ত্র। ফলে, সনাতন সমাজতন্ত্র কেন এভাবে বিনা প্রতিরোধে ভেঙে পড়ল, সে প্রশ্নের উত্তরে এঁরা একটা মন্ত্রই জপেন — 'সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত'। নিজেদের পুরনো ধ্যানধারণাগুলোকে নতুন তথ্যের আলোকে যাচিয়ে নেবার কোনো তাগিদ এঁরা অনুভব করেন না। কোনো মৌলবাদীই করে না। তাই কোনো লোক যদি বাঁধা গতের বাইরে গিয়ে অকাট্য তথ্যের ভিত্তিতে কোনো প্রশ্ন তোলেন, কিংবা অন্য কোনো সম্ভাব্য বিকল্পের কথা বলেন, অমনি তিনি হয়ে যান 'সাম্রাজ্যবাদের দালাল'।

মৌলবাদী কমিউনিস্টদের কাছে প্রশ্ন: পুঁজিবাদী কাঠামোর মধ্যেই যাঁরা মানুষের মঙ্গলসাধনের কথা বলছেন তাঁদের নির্বিচারে 'দালাল' বলে গাল পাড়তে হলে, এত বেশি সৎ লোককে 'দালাল' বলতে হবে যে শেষ পর্যন্ত বিপ্লব করার জন্য লোক পাওয়া যাবে তো? তাছাড়া উগ্র পরমত-অসহিষ্ণুতা যে ফ্যাসিজমের লক্ষণ, সেটা আজকের ভারতে দাঁড়িয়ে কারোই কি ভুলে যাওয়া উচিত?

তার চেয়ে বরং অমর্ত্য সেন ঠিক যা, সেইভাবেই তাঁকে গ্রহণ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তিনি যা নন সেটা ধরে নেওয়ার প্রয়োজন কী? ঐরকম ধরে নিই বলেই তো তাঁকে আমরা বিপ্লবী বানাই, এবং প্রত্যাশা না মিটলে দালাল বলি। সেইজন্যেই, খোদ সুইডেনে অল্পবুদ্ধি বাঙালি টিভি প্রতিবেদক পাঠিয়ে আমরা তাঁর 'বাণী' চাই, এবং চেয়ে বকুনি খাই। তিনি আর যাই হোন, বাণী-দেওয়া বাঙালি নন।

অমর্ত্য সেন প্রবলভাবে স্বতন্ত্র, প্রখরভাবে আত্মসচেতন, তীক্ষ্ণরূপে বিজ্ঞানচেতন এক যুক্তিবাদী বাঙালি। অন্যের পোঁ-ধরা মানুষ তিনি নন। অর্থাৎ তিনি সেই বাঙালি যাকে আজ আর বাঙালি জাতির মধ্যে চট করে দেখা যায় না। বাঙালি মননজীবীর এই ধারালো স্বাতন্ত্র্যের ছবিটা নতুন করে তুলে ধরার জন্যেই বোধহয় অমর্ত্য সেনের নোবেল পুরস্কার পাওয়া দরকার ছিল।

উ মা

Political mind not in politics .....

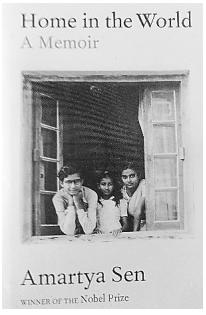

"While remaining deeply sympathetic to the removal of inequality and injustice in the world, and continuing to be suspicious about of authoritarianism and poltical piety, I soon decided that I could never be member of any political party that demanded conformity. My political activism would have to take a different form."
Amartya Sen in the book 'Home in the World - A Memoir' published Allen Lane (Penguin), 2021 (page-203)

দেবস্থানে সাবধান

প্রদীপ চক্রবর্তী

উন্নয়ন বলতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং প্রযুক্তিগত মান উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পরিকাঠামো ও পরিষেবার সম্প্রসারণ জড়িত। কার্যকর উন্নয়ন কৌশলগুলির লক্ষ্য —বৈষম্যের মোকাবিলা করা, স্থায়ী সমৃদ্ধি উন্নীত করা এবং সমস্ত ব্যক্তির জন্য তাদের পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা পৌঁছানোর সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। শিক্ষা-স্বাস্থ্য এবং প্রযুক্তিতে বিনিয়োগের পাশাপাশি এবং মানবাধিকারের প্রচারের মাধ্যমে এটি অর্জন করা যেতে পারে। উন্নয়ন একটি জটিল এবং বহুমুখী প্রক্রিয়া, এর জন্য সরকার, সুশীল সমাজ এবং বেসরকারি সংস্থা ইত্যাদি সকলেরই সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ প্রয়োজন। পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি পদ্ধতি, যা স্থায়িত্বকে অগ্রাধিকার দেয় এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব কমায়। এই ধারণাটি স্বীকৃতি দেয়— যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশ সুরক্ষা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করতে পারে এবং পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভারসাম্য বজায় রাখতে প্রবলভাবে সক্ষম। পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে নবীকরণযোগ্য শক্তি, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ, বর্জ্য ও দূষণ হ্রাস এবং ভৌগোলিকভাবে ভূমি ব্যবহারের মতো অনুশীলন। এই পদ্ধতির চূড়ান্ত লক্ষ্য হল বর্তমান মানব সভ্যতার জীবনযাত্রার মান উন্নত করার সাথে সাথে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও উন্নত বাসযোগ্য বিশ্ব তৈরি করে যাওয়া। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, পার্বত্য অঞ্চলের বেপরোয়া উন্নয়ন বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা এবং নেতিবাচক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। প্রথমত এটি মাটির ক্ষয় এবং অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারে, যার ফলে ভূমিধ্বস এবং প্রাকৃতিক ভূ-চিত্রের অবক্ষয় ঘটতে পারে। দ্বিতীয়ত এটি সূক্ষ্ম বাস্তুতন্ত্রকে ব্যাহত করতে পারে এবং স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের ক্ষতি করতে পারে। তৃতীয়ত এটি জল দূষিত করতে পারে ফলত জলের গুণমান হ্রাস করবে, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য ও জনকল্যাণকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে থাকে। চতুর্থত পাহাড়ি ভূখণ্ডের উন্নয়নের জন্য প্রায়শই ব্যাপক খনন এবং গাছপালা অপসারণের প্রয়োজন পড়ে, যা সংশ্লিষ্ট নির্মাণ কার্য ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ হয়ে থাকে। সামগ্রিকভাবে পার্বত্য অঞ্চলে বেপরোয়া উন্নয়ন; পরিবেশ এবং স্থানীয় মানব সমাজের উপর সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে থাকে।

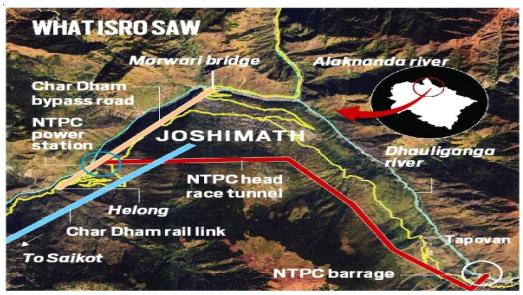

যোশীমঠের ভূমিধ্বসের সম্ভাব্য কারণগুলি নিয়ে যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে নিম্নলিখিত কারণগুলি প্রাথমিকভাবে উঠে আসে।

(১) যোশীমঠ শহরটি একটি ভূমিধ্বসের ধ্বংসাবশেষের উপর নির্মিত হয়েছিল, তাই এর ভিত্তি কখনোই খুব মজবুত ছিল না। (২) অলকানন্দা নদীর প্রবাহ নীচ থেকে শহরের ভিতকে নষ্ট করছে। (৩) যোশীমঠ শহরের নীচে একটি টানেল নির্মাণকেও এই বিপর্যয়ের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। (৪) যোশীমঠকে পার্শ্বপথ (বাইপাস) করে চারধাম 'সর্ব-আবহাওয়া সড়ক' (ধাতব রাস্তাগুলি সিমেন্ট কংক্রিট বা কয়লার বিটুমিন দিয়ে তৈরি। বর্ষায় তারা অকেজো হয় না) নির্মাণ। (৫) নির্মাণ কাজের জন্য শহরের কাছাকাছি পাহাড়ে অবিরাম চালানো বিস্ফোরণ।

প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, যোশীমঠ ভারতের সিসমিক জোনের জোন ৫-এ অবস্থিত, যা একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে নির্দেশ করে।

ইতিমধ্যেই উত্তরাখণ্ডের মুখ্য সচিব বলেছেন যে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় রাজ্য এবং জেলা আধিকারিকরা জমির পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেছেন এবং জানিয়েছেন যে প্রায়

৩৫০ মিটার প্রস্থের একটি ভূখণ্ড ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা এবং বিশেষজ্ঞরা উত্তরাখণ্ড সরকারকে যোশীমঠ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার পরিকল্পনা তৈরি করতে সহায়তা করছেন এবং এক্ষেত্রে মানুষের নিরাপত্তাকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিএমএ), ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট, জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, আই আইটি রুরকি, ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হাইড্রোলজি এবং সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞদের একটি দল পরিস্থিতি অধ্যয়ন করছে এবং শীঘ্রই তারা যোশীমঠের স্বাভাবিক পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার করতে তাদের সুপারিশ জমা দেবেন বলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির সাথে সেখানকার অধিবাসীদের পুনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করার কথা বলেছেন। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর যোশীমঠকে 'ভূমিধ্বস-প্রবণ অঞ্চল' হিসাবে ঘোষণা করেছে এবং বিশেষজ্ঞদের কী করতে হবে সে সম্পর্কে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা তৈরি করতে বলেছে। এনটিপিসির টানেলের কাজ আপাতত স্থগিত করা হয়েছে, তবে সরকার এনটিপিসি এই সংকটের জন্য দায়ী কিনা এই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসার আগে সঠিকভাবে তদন্ত করে দেখবে।

আগেই বলা হয়েছে যে, উত্তরাখণ্ডের যোশীমঠের ভূমি অবনমনের কারণগুলি উদ্ঘাটনের জন্য একাধিক সরকারি সংস্থা কাজ করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে অবিরাম টানেলিং এবং দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং কর্তৃপক্ষের ইচ্ছাকৃত 'সু-পরামর্শের প্রতি অবহেলা'-র কারণে তথাকথিত আধ্যাত্মিক পর্যটন কেন্দ্রের সঙ্গে সংযোগের জন্য পরিচিত এই শহরের প্রাকৃতিক স্থিতাবস্থার অবনমন ঘটেছে। তাঁরা পার্বত্য অঞ্চলে এই ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ রোধ করতে, এই অঞ্চলে পরিকল্পনা করা প্রকল্পগুলির সঠিক বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের পরামর্শ দিয়েছেন।

হায়দ্রাবাদের ইন্ডিয়ান স্কুল অফ বিজনেস (আই এসবি)-এর ভারতী ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক পলিসির গবেষণা পরিচালক অঞ্জল প্রকাশ বলেছেন যে জনবহুল এলাকায় 'উন্নয়নের' বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সতর্কীকরণ অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হওয়ায় যোশীমঠ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। তাঁর মতে, 'হিমালয় পর্বত পৃথিবীর সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ পার্বত্য অঞ্চল; গঠনের দিক থেকে সর্বকনিষ্ঠ'। স্থানীয় বাসিন্দাদের বসবাসের জন্য উপযুক্ত পরিকাঠামো প্রয়োজন;স্বাস্থ্য ও শিক্ষার জন্য চাই উপযুক্ত এবং বিজ্ঞানসম্মত প্রকল্প। কিন্তু জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কি এই পাহাড়ি ভূমিধ্বস প্রবণ এলাকায় স্থাপন করা একান্তই দরকার? এই প্রশ্নটি উঠছে বারবার, কারণ বেশিরভাগ ভূমিধ্বসের প্রবণতা টানেলিং প্রক্রিয়ার কারণে ঘটেছে। 'সমস্ত আপত্তি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে এই প্রকল্পগুলি অনুমোদন করা হয়?' বলেছেন প্রকাশ, যিনি আগে টিইআরআই—স্কুল অফ অ্যাজভান্সড স্টাডিজের সাথে আঞ্চলিক জল অধ্যয়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি হিন্দুকুশ হিমালয় অঞ্চলের হিমবাহী নদী নিয়ে গবেষণারও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রকাশ আরও পরামর্শ দিয়েছেন যে, হিমালয়ে উন্নয়নের নির্দেশক প্রকল্প বা নীতিগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নের। প্রয়োজন রয়েছে 'আমাদের সমস্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বন্ধ করতে হবে এবং তাদের পুনর্মূল্যায়ন করতে হবে। পরিবেশগত সম্ভাব্যতা যাচাই করতে হবে এবং স্বাধীন সংস্থাগুলির দ্বারা প্রকল্পগুলির পরীক্ষা করাতে হবে। বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তিকে অবশ্যই নীতি নির্দেশনা ও তদারকির কাজে ব্যবহার করতে হবে পরিবেশের দিকে লক্ষ্য রেখে'। উত্তরাখণ্ডের কাউন্সিল ফর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (সি এস টি) মহাপরিচালক রাজেন্দ্র ডোভালও বলেছেন যে এই বিপর্যয়ের জন্য এই অঞ্চলে স্পষ্টতই পরিবেশবান্ধবতাহীন ও উদাসীন নির্মাণকে দায়ী করা যেতে পারে। তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, 'ব্যবস্থা এমন যে পাহাড়ে বাড়ি বা হোটেল নির্মাণের জন্য যথাযথ দক্ষ শ্রমিক বা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ নেই। বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদনগুলি, অতীতে, শুধুমাত্র বলেছিল যে অঞ্চলটি ভঙ্গুর, কিন্তু এটি প্রতিরোধ করার জন্য সুপারিশ করা হয়নি। উদাসীন এবং বল্গাহীন নির্মাণ জমির উপর চাপ সৃষ্টি করেছে, যা তার বহন ক্ষমতার বাইরে'।

এই এলাকায় জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য টানেল নির্মাণকেও যোশীমঠের ভূস্খলনের একটি প্রধান কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। জলশক্তি মন্ত্রক অবিলম্বে যোশীমঠের ভূমি অবনমন অধ্যয়ন করতে এবং মানব বসতি, মহাসড়ক এবং নদীপ্রবাহ ব্যবস্থার সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বন্দোবস্তের পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি ছয় সদস্যের কমিটি গঠন করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রক এবং ভারতের জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেলকে তিন দিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে মানব বসতি এবং অবকাঠামো রক্ষার জন্য

তাদের তথ্য অনুসন্ধান প্রতিবেদন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ জমা দিতে বলা হয়েছিল। দাখিলি প্রতিবেদনে কি কি বিষয়ে রেখাপাত করা হয়েছে, তা অবশ্য এখনো জানা যায় নি। কারণ, ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি (এনডিএমএ) একটি 'গ্যাগ অর্ডার জারি করেছে। এতে সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানকে মিডিয়ার সাথে যোগাযোগ না করতে এবং যোশীমঠে ভূমি তলিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে মুখ না খুলতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যে, রাজ্য সরকার বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়া শুরু করেছে, কারণ বেশ কয়েকটি বাড়ি, রাস্তা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদে ফাটল দেখা দিয়েছে। দুর্যোগ নিরোধক ব্যবস্থাপনা এবং স্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত উপদেষ্টা অনিল জাগ্নি বলেছেন যে পার্বত্য রাজ্যের পরিস্থিতি বড় একটি বিপর্যয়ের অপেক্ষায় রয়েছে; কারণ বছরের পর বছর ধরে 'ভঙ্গুর' পাহাড়ে 'বাণিজ্যিক উন্নয়ন' এই অঞ্চলটিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলেছে। হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত যোশীমঠ একটি প্রাচীন ভূমিধ্বসের জায়গায় গড়ে ওঠা উত্তরাখণ্ডের একটি ছোট শহর, যা গত কয়েক দশকে নির্মাণ ও জনসংখ্যার বিস্ফোরণের উদাহরণ হয়ে উঠেছে। দেরাদুনের ওয়াদিয়া ইনস্টিটিউট অফ হিমালয়ান জিওলজির অধিকর্তা ড. কালাচাঁদ সেন বলেছেন, যোশীমঠ— যা নাকি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২০০০ মিটার উপরে অবস্থিত একটি শহর, সবসময়ই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল কারণ এটি একটি পুরনো ভূমিধ্বসের ধ্বংসাবশেষের উপরে বসে আছে। প্রায় ৫০ বছর আগে (১৯৭৬) কেন্দ্রীয় সরকার কেন যোশীমঠ ডুবছে, তা খতিয়ে দেখতে গাড়ওয়ালের তৎকালীন কালেক্টর এম সি মিশ্রকে নিয়োগ করেছিল। ১৮ সদস্যের কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেছিল, তাতে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল—যোশীমঠ একটি পুরনো ভূমিধ্বস অঞ্চলে অবস্থিত এবং যদি উন্নয়ন অবিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে, তবে ভবিষ্যতে এটি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে এবং সেই সঙ্গে যোশীমঠে যে কোনো নির্মাণ নিষিদ্ধ করারও সুপারিশ করা হয়েছিল। নির্মাণের কারণে ভূগর্ভস্থ জলের উৎসগুলো বন্ধ থাকলেও জল এলোমেলোভাবে প্রবাহিত হতে থাকে এবং পুনরায় প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে। তার কারণ, দুর্বল নিষ্কাশন ব্যবস্থা, যা যোশীমঠকে করুণ পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গেছে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, ভূমিধ্বসের কারণে, ৭২০টিরও বেশি ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে; যেখানে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে এবং কয়েক হাজার স্থানীয় অধিবাসীকে ইতিমধ্যেই স্থানান্তরিত করা হয়েছে। অনিরাপদ বাড়িগুলোকে লাল অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সেগুলো ভেঙে ফেলার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশনের (ইসরো) ন্যাশনাল রিমোট সেন্সিং সেন্টার, উত্তরাখণ্ডের শহর যোশীমঠের ভূমিধ্বসের উপগ্রহ চিত্র প্রকাশ করেছে। ২০২২-এর ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারি ২০২৩-এর দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে ১২ দিনে যোশীমঠের অবনমন এলাকা ৫.৪ সেন্টিমিটার বসে গিয়েছে, যেখানে এটি এপ্রিল এবং নভেম্বর ২০২২-এর মধ্যে সাত মাসে ৯ সেন্টিমিটার বসে যাওয়া রেকর্ড করেছিল। যোশীমঠে অবিরাম ভূ-পৃষ্ঠের জল নিঃসরণ—যা ভূমিধ্বসের সমস্যার জন্য প্রাথমিকভাবে দায়ী কারণগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বিবেচিত; ২৭ জানুয়ারি ২০২৩-এ প্রতি মিনিটে ১৭১ লিটারে নেমে এসেছে। প্রাথমিকভাবে ৬ জানুয়ারি ২০২৩-এ যা ছিল প্রতি মিনিটে ৫৪০ লিটার। উত্তরাখণ্ডের দুর্যোগ সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা বিভাগের সচিব রঞ্জিত সিনহা এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রকৃতির রোষানলে ধর্মালয়

২৩ ফেব্রুয়ারির খবর অনুযায়ী ভূ-বিধ্বস্ত যোশীমঠের অধিবাসীদের ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যসামগ্রী মজুত করার জন্য যেসকল গুদাম ব্যবহৃত হয়েছিল, সেইসব গুদামগুলিতেও ফাটল ধরেছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই সুবিধাটিকে পিপলকোটি বা তপোবনে স্থানান্তর করার প্রস্তাব করেছেন। সবচেয়ে মজার কথা হল, উভয় শহরই যোশীমঠ থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে। এক হতাশ স্থানীয় অধিবাসীর মুখে ফুটে উঠেছে হতাশার কথা, 'প্রথমে আমাদের বাড়িগুলি প্রভাবিত হয়েছিল এবং এখন রেশন। খাদ্যশস্য সংগ্রহ এখন একটি প্রধান সমস্যা হতে পারে। যদি বর্তমান অবস্থান থেকে খাদ্যশস্য সঞ্চয় স্থানের সুবিধা স্থানান্তরিত করা হয়, তাহলে এই উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্থানীয় মানুষকে অনেকদূর যেতে হবে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে।'

উত্তরাখণ্ড সরকার এইবছর 'স্মার্ট চারধাম যাত্রা'-র আয়োজন করেছেন। এই প্রতিবেদনটি লেখার সময় পর্যন্ত ৮১০০০-এরও বেশি পুণ্যার্থী কেদারনাথ ও বদ্রিনাথ যাত্রার জন্য অনলাইন-এ নাম নথিভুক্ত করে ফেলেছেন। নথিভুক্ত যাত্রীদের প্রত্যেকের কাছে একটি কিউ আর কোড যাবে চলভাষের মাধ্যমে। কিউ আর কোড ব্যতীত এবছর কোনো পুণ্যার্থীকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না।

ভূমিধ্বসপ্রবণ এলাকা	রাজ্য এবং শহর
পশ্চিম হিমালয়	হিমাচলপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড
পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব হিমালয়	পশ্চিমবঙ্গ, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম
নাগা-আরাকান পর্বত বেল্ট	ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মণিপুর
পশ্চিমঘাট অঞ্চল ও নীলগিরি	কেরালা কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, গোয়া
উপদ্বীপ ভারত নিয়ে গঠিত মেঘালয় মালভূমি	ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশ

বিগত কয়েক বছরে উত্তরাখণ্ডে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিসংখ্যান — ১) ১৯৯১ উত্তরকাশী ভূমিকম্প: ১৯৯১ সালের অক্টোবরে অবিভক্ত রাজ্য উত্তরপ্রদেশে ৬.৮ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হানে যাতে অন্তত ৭৬৮ জন নিহত হন এবং হাজার হাজার ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়।

২) ১৯৯৮ মালপা ভূমিধ্বস: পিথোরগড় জেলার মালপা নাম ছোট্ট গ্রামটি ভূমিধ্বসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। সেখানে ৫৫জন কৈলাস মানসরোবর তীর্থযাত্রী সহ প্রায় ২৫৫ জন নিহত হয়েছিলেন। জমে থাকা ধ্বংসাবশেষ শারদা নদীকে আংশিকভাবে অবরুদ্ধ করে রেখেছিল।

৩) ১৯৯৯ চামোলি ভূমিকম্প: ৬.৮ মাত্রার ভূমিকম্পে চামোলি জেলায় ১০০ জনেরও বেশি লোক মারা যান। পার্শ্ববর্তী রুদ্রপ্রয়াগ জেলাও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূমিকম্পের ফলে বেশ কিছু ভূমি বিকৃতির খবর পাওয়া যায় এবং ভূমিধ্বস এবং জলপ্রবাহের পরিবর্তনও রেকর্ড করা হয়। রাস্তাঘাট ও মাটিতে ফাটল দেখা গিয়েছিল।

৪) ২০১৩ সালে উত্তর ভারতের বন্যা :২০১৩ সালের জুন মাসে উত্তরাখণ্ডকে কেন্দ্র করে কয়েক দিনের মেঘ ভাঙা বৃষ্টিতে বিধ্বংসী বন্যা এবং ভূমিধ্বস হয়। রাজ্য সরকারের মতে, দুর্যোগে ৫৭০০ জনেরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল। সেতু ও রাস্তা ধ্বংস হওয়ায় চরধাম তীর্থস্থানের দিকে যাওয়া উপত্যকায় ৩ লাখেরও মানুষ আটকা পড়েছিলেন।

'নৈনিতাল সমাচার' নামে স্থানীয় একটি হিন্দি পাক্ষিক পত্রিকার প্রতিবেদক অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে লিখছেন, 'হিমালয়ের উপর চরম অত্যাচারের পরিণতি আজকের এই যোশীমঠ'। বিশিষ্ট কুমায়ণী কবি গিরিশ তিওয়ারি 'গিরদা' লিখছেন, 'উউফ!! তুমহারী ইয়ে খুদ্গারজি/চলেগি কব্ তক ইয়ে মনমর্জি/জিস দিন ডোলেগী ইয়ে ঘরতি/সর সে নিকলেয়গী সব মস্তি'।

ভগবান নয়, প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব মানুষেরই। প্রকৃতির রোষানল থেকে দেবালয়ও ছাড় পায় না। ভূস্খলন প্রভাবিত যোশীমঠের ভূলুণ্ঠিত দেবালয়ের ছবি ইতিমধ্যেই দেশের প্রায় সব ভাষার সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যকে 'জৈবিক রাজ্য' বানানোর স্বপ্ন দেখছেন। তাঁর স্বপ্ন সাকার হবে তখনই, যখন রাজ্যের মানুষ এবং তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এককাট্টা হয়ে এই সবুজ পৃথিবী ধ্বংস করার থেকে নিজেদের বিরত রাখবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

The Times of India, The Hindusthan Times,NDTV, অমর উজালা, দৈনিক জাগরণ, নৈনিতাল সমাচার, Google Search Engine, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে প্রচারিত 'মুখ্যমন্ত্রী সংবাদ' এবং স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ।

উ মা

বিনা মন্তব্যে

অন্তঃসত্ত্বা মহিলাকে পড়তে হবে, রাম হনুমান কিংবা শিবাজীর সংগ্রামের কাহিনী। তার ফলে জন্মের আগে থেকেই গর্ভের সন্তান ভারতীয় সংস্কারে অভ্যস্ত ও দেশপ্রেমী হয়ে উঠবে— এমনি যুক্তি খাড়া করলেন দেশের একটি মহিলা সংগঠন। সংগঠনটির কর্মসূচিতে এর নাম দেওয়া হয়েছে 'গর্ভ সংস্কার'।

এখন থেকে সেতু প্রকাশনী-তে উৎস মানুষ-এর বই ও পত্রিকা পাওয়া যাবে।

সেতু প্রকাশনী। ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

(কফি হাউসের পাশের গলি)

ফোন নং — ৯০৭৩৮১৬৯৪৪

করে দেখো ভালো লাগবে

শুভেন্দু দাশগুপ্ত

সংখ্যায় কম হলেও ছোটদের জন্যে উৎস মানুষ পত্রিকায় লেখা বেরিয়েছে। সহমর্মিতা, সমাজ চেতনা, যুক্তি দিয়ে বিচার করে কোনও কিছু গ্রহণ করার শিক্ষাটা সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের ভেতরে তিল তিল করে গড়ে ওঠে। আর তাতে পরিবারের অভিভাবকদের ভূমিকা যে বিরাট তা বলাই বাহুল্য। শিশুকাল থেকে বড়দের থেকে 'ঠাকুর নমো কর', ভূত-প্রেত তাড়াতে 'রাম রাম' বা সাপের ছোবল থেকে বাঁচতে 'মা-মনসা-গরুড়-গরুড়' শিখে ফেলা মনকে যুক্তির পথে টেনে আনা বেশ কষ্টকর। একইভাবে শিশুকাল থেকে পারিপার্শ্বিক নিয়ে উদাসীন থাকার শিক্ষাটাও মূলত বাড়ির বড়দের আচরণ থেকে আমাদের ভেতরে ঢুকে যায়। সুশিক্ষার জন্মও বাড়িতে। 'করে দেখো ভালো লাগবে' ছোটদের কথা ভেবে লেখা হলেও, তা বড়দেরও। 'যদি পছন্দ হয় আর ছাপাও তাহলে এটা ধারাবাহিক করবো। একটা পরীক্ষায় নামবো।' লেখক তেমনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। — স.ম.

একদিন, কোনো একটা ছুটির দিন।

তুমি নিজে কিংবা, ভালো হয়, দুচার জন বন্ধুকে জুটিয়ে, সবার হাতে একটা করে খাতা আর কলম নিয়ে, নিজেদের বাড়ির চারপাশে, যাকে আমরা 'পাড়া' বলি, বেরিয়ে পড়ো।

দেখো, কত মানুষ কত কী কাজ করছে।

যেমন একজন জুতো সেলাই করছে, জুতো পালিশ করছে, মুচি; কেউ রিকসা চালাচ্ছে, রিক্সাওয়ালা; কেউ রাস্তা ঝাড় দিচ্ছে, ঝাড়ুদার; কেউ কিছু বিক্রি করছে, ফেরিওয়ালা; কেউ জামাকাপড় ইস্ত্রি করছে, ইস্ত্রিওয়ালা। আমি আর বলছি না, এবার তোমরা খোঁজো।

একটা তালিকা বানাও খাতায়।

দেখো কতজন লোক কত কী করছে, কত কাজে রয়েছে। সবাই নিজের জন্য নয়, অন্যদের জন্য, তোমাদেরই জন্য।

বাড়ি ফিরে খাতাটা খুলে পড়ো।

দেখবে কত জন কতো কী করে। তোমার জন্য, তোমাদের বাড়ির সকলের জন্য।

ওরা ওই কাজগুলো করে বলেই তোমার, তোমদের কতো সুবিধা হয়, তোমাদেরকে এই কাজগুলো আর করতে হয় না। তোমাদের সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে বলে তোমরা তোমদের নিজের নিজের কাজগুলো করার সময় পাচ্ছো।

চুপ করে ভেবে দেখো তো!

এক একদিন খাতা কলম নিয়ে এক একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াও, সুযোগ থাকলে বসো।

জেনে নাও —

তার নাম

বয়স

এখন কোথায় থাকে?

বাড়ি, 'দেশের বাড়ি' কোথায়, মানে কোথা থেকে এখানে এসেছে?

বাড়িতে আর কে কে আছে?

তারা কে কি করে?

কেন দেশের বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছে?

দেশে কি জমি আছে?

থাকলে কে চাষ করে? সেই জমিতে কি চাষ হয়? চাষের ফসল দিয়ে কি হয়?

চাষের ফসল দিয়েই কি খাবার জোটে নাকি খাবার কিনতে হয়?

এখানে কত আয়, মাসে কত রোজগার (একটা আন্দাজ)?

সেই রোজগারের কত টাকা এখানে থাকার জন্য খরচ করা হয়?

আর কত টাকা দেশে পরিবারকে পাঠাতে হয়?

রোজগারের টাকা থেকে কি কিছু জমানো যায়? কত?

এখানকার রোজগার কি বাড়ছে না কমছে?

কমলে কেন কমছে?

এখানকার খরচ কি কি?

সেই খরচ কি বাড়ছে, না কমছে?

বাড়লে কেন বাড়ছে?

এই অব্দি ধরিয়ে দিলাম।

এরপর তোমরাই প্রশ্ন বানাও। কথা শুনে কথার পিঠে প্রশ্ন বানাও। প্রশ্নের উত্তর পেয়ে তার সাথে মিলিয়ে আরও প্রশ্ন করো।

এইভাবে প্রশ্ন করতে করতে আর উত্তর পেতে পেতে তোমার, তোমাদের মাথায় আসবে অনেক কিছু।

যেমন ধরো ভূগোল, অর্থনীতি, কৃষি, চাষ, পরিষেবা, কাজ,

মজুরি, (কমে যাওয়া, বেড়ে যাওয়া)।

আয়, (কমে যাওয়া, বেড়ে যাওয়া)।

খরচ, (কোন কোন খাতে কত বেড়ে যাওয়া, কমে যাওয়া)।

জিনিসের দাম (বেড়ে যাওয়া কমে যাওয়া)।

জমানো সঞ্চয় (বেড়ে যাওয়া, কমে যাওয়া)।

ধার করা। গ্রাম থেকে শহরে চলে আসা।

কেন চলে আসা, গ্রামের অবস্থা। এখানে কত ধরনের কাজ, পুরনো কাজ হারিয়ে যাওয়া, নতুন কাজ তৈরি হওয়া।

এমন সব, কথা, ভাবনারা আসবে, আসতে থাকবে।

সব কিছুই জানতে হবে, জানা যাবে তার কোনো দরকার নেই, যে কটা, যতটুক হোক তাতেই হবে। এমনও হতে পারে এর বাইরে অন্য অন্য কিছু তোমাদের মাথায় আসবে। তাহলে তো দারুণ।

যখন একা কিংবা দল বেঁধে হাঁটতে থাকবে, তখন পাড়ার একটা মানচিত্র এঁকে নেবে —কোথায় কি কি আছে। কি কি দেখতে পারো, কি কি আঁকবে বলে দিচ্ছি না। তোমরাই খুঁজবে, দেখবে, ভাববে, আঁকবে।

বাড়ি ফিরে এসে মা, বাবা, বোন, ভাই, দিদিমা, দাদু, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা, জ্যেঠিমা, জ্যাঠা, কাকিমা, কাকা, দিদি, দাদা এদের সাথে মানচিত্রটা নিয়ে বসো। তাদেরকে বলো মানচিত্রটাতে দেখিয়ে দিতে আগে কি ছিলো, এখন নেই, তার বদলে কি হয়েছে। হতে পারে পুকুর, মাঠ, বড়ো গাছ, ছোটো দোকান, আরও কত কী। জেনে নাও, যা যা আগে ছিল এখন নেই। কেন নেই। জানতে পারবে কার বদলে কি এলো, কেন এলো। আরও একটু ভাববে—যার বদলে যা এলো তাতে কি খারাপ হলো না ভালো হলো। কারা বদলে দিল? তাদের কি লাভ?

লিখে ফেলো কথাগুলো তোমাদের কথা, বড়োদের কথা।

আরও একটু ভাবতে বসো।

এবার এই ভাবনাতে ডেকে নাও পাড়ার বন্ধুদের, পাড়ার বাইরের বন্ধুদের। কথা বলো এখনও যা যা আছে পাড়ায় তা বাঁচিয়ে রাখা দরকার কিনা? কেন দরকার? বাঁচিয়ে রাখলে কি লাভ? হারিয়ে গেলে কি লোকসান?

একটা তালিকা বানাও।

যেমন — পুকুর, খেলার মাঠ, ছোটো দোকান, ক্লাব, লাইব্রেরি, ব্যায়ামাগার, গাছ, বাগান, নয়নজলি, পাখিদের বাসা, ফলের বাগান, বড়োদের চায়ের দোকান, লম্বা টানা দেওয়াল।

এসব কথা তোমরা নিজেরা বড়ো একটা কাগজে লিখে, এসব কথা রচনা, কবিতা, গল্পে লিখে, ছবি এঁকে দেওয়ালে সেঁটে দাও। দেওয়াল পত্রিকা বানাও।

লাইব্রেরিতে সপ্তাহে অন্তত একদিন সন্ধ্যেবেলা গিয়ে বই বেছে নিয়ে আসবে। রোজকার খবরের কাগজটা একবার দেখে নেবে, কোনো খবর পড়তে ইচ্ছে করলে পড়বে। একটা খাতা নিয়ে যাবে, সেই খাতায় কোনো একটা খবরের কোনো কিছু যদি মনে ধরে লিখে নিয়ে আসবে। বাড়ি এসে পড়ে নিয়ে প্রশ্ন বানাবে। বাড়ির বড়োদের কাছে জেনে নেবে উত্তর। খাতায় লিখে রাখবে।

এইসব প্রশ্ন আর উত্তর নিয়ে তোমার ভাবনা লিখবে দেওয়াল পত্রিকাতে। তোমার ভাবনা অন্যরা জানতে পারবে। তারাও ভাববে। লিখবে। একজনের ভাবনার সাথে অন্যজনের ভাবনা না মিললে আরও ভালো হবে। তর্ক হবে।

একদিন তর্ক করতে বসবে। একজন বা দুজন তর্কগুলো যতটা পারো লিখে রাখবে। সেই সব তর্ক থেকে আরও অনেকের ভাবনা তৈরি হবে। মাথার মধ্যে অনেক ভাবনা আসবে। যত ভাবনা আসবে ততো ভালো। একটা ভাবনা থেকে আরেকটা ভাবনা আসে। তখন দেখবে মোবাইল ফোন খুলে এটা সেটা দেখতে, শুনতে ইচ্ছে করবে না।

দেওয়াল পত্রিকাগুলো দেওয়াল থেকে খুলে ফেলে দেবে না। যত্ন করে গুছিয়ে রাখবে। বছর শেষে পত্রিকার লেখাগুলো নিয়ে বসবে।

নিজেরাই বাছবে প্রত্যেকের একটা করে লেখা। তারপর তার একটা সংকলন বের করবে ছাপিয়ে। হয় কাছাকাছি কোনো ছাপাখানায় নিজেরা যাবে। নয়তো বাড়ির বড়োদের বলো তাদের চেনা জানা কোথাও থেকে ছাপিয়ে নিয়ে আসতে। ছাপা হয়ে এলে নিজেরাই বিলি করবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিংবা রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে। পাড়ার লোকেদের পড়িয়ে মতামত লিখিয়ে নেবে।

এই পত্রিকা হবে তোমাদের পাড়া দেখা, দেখা নিয়ে ভাবা, কথা বলা, জানা, জানা নিয়ে ভাবা। এসব এক জায়গায় রেখে দেওয়া।

শুরু করে দাও।

যেখানে আটকাবে জানাবে। আমরা থাকবো।

এখানে যা যা লেখা হলো তা কোনটাই বানিয়ে নয়। আমরা করেছি। তোমরাও করো। করে দেখো কী যে ভালো লাগবে।

জানিও। পরে আবার কথা হবে।

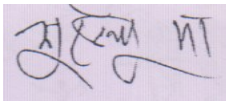

উমা

[লেখাটা নিয়ে পাঠকের মতামত পেলে আমরা উৎসাহিত হব।]

ব্যক্তি ধীরেন্দ্রনাথ

সমীরকুমার ঘোষ

এদেশে পাভলভীয় মনোবিজ্ঞান চর্চার পথিকৃৎ মনোরোগবিশেষজ্ঞ
ডা: ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবন ও কাজের কথা

চতুর্থ পর্ব

পাভলভ পরিবার ও আড্ডা : ডাক্তারি, নাটক, সভাসমিতি-আলোচনার রেশ ধরেই ১৯৬১ সালের আগস্টে জন্ম নেয় ত্রৈমাসিক পত্রিকা ‘মানবমন’।

চিকিৎসক ও অন্য পেশার বন্ধুবান্ধব, সেরে-ওঠা বা চিকিৎসাধীন রোগী, ভাইপো-ভাইঝি, ভাগ্নে-ভাগ্নি — সবাইকে নিয়ে গড়ে ওঠে পাভলভ পরিবার। মনোরোগ চিকিৎসক, মানবাধিকার নিয়ে সরব, কবি, নাট্যকার, দার্শনিক, খেলাপাগল মানুষটি ছিলেন আদ্যন্ত আড্ডাবাজও। পাভলভ ইনস্টিটিউটের পত্তনের পর থেকেই মঙ্গলবার রোগী দেখতেন না। ডা: জ্যোতির্ময় শর্মা, ডা: সোমনাথ মুখার্জি, চন্দননগরের ডা: নরেশ গাঙ্গুলি — সবাই মিলে আড্ডা জমাতেন। পরে একে একে জড়ো হন প্রাক্তন রোগী, ভাগ্নে ও তাঁর বন্ধুর দল, আমার মতো অর্বাচীনও। ১৯৬২-তে একমাসের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে স্ত্রীকে চিঠিতে লেখেন, ‘মঙ্গলবারের আড্ডার কথা ভেবে মন খারাপ লাগছে। দিন গুনছি— মাত্র চারদিন। আরও ছাব্বিশ দিন!’

ফুটবল-প্রেম : মনোবিজ্ঞানের মতো কঠিন বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও ওঁর প্রথম প্রেম ছিল ফুটবল। কট্টর মোহনবাগানি। মেয়ে জানিয়েছে, একবার মোহনবাগান জেতায় বাথরুমে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙেছিলেন। মোহনবাগানের সব খেলা মাঠে গিয়ে দেখতেন। ১৯১১-য় বুটপরা সাহেবদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে খেলে মোহনবাগান জয়ী হয়েছিল— এটাই ছিল ওঁর মোহনবাগান প্রীতির শিকড়। কোনো কিশোরকে তার বাবা-মা চিকিৎসার জন্য নিয়ে এলে ওঁর প্রথম প্রশ্ন হত, ছেলে খেলাধুলো করে তো? খেললে আর কোনো চিন্তা নেই — ছেলের সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। বিয়ের দিন শিল্ড ফাইনাল খেলা ছিল। সেই খেলা দেখে মাঠ থেকে সোজা বিয়ের আসরে হাজির হয়েছিলেন। খেলা পাগলামো নিয়ে কথা উঠলে স্ত্রী অমিয়া এ ঘটনার কথা প্রায়শই বলতেন। আমিও দেখেছি, ব্যস্ততা এবং বয়সের কারণে মাঠে গিয়ে খেলা দেখতে পারতেন না। কিন্তু হয়ত বড় দলের খেলা আছে। রোগী দেখতে দেখতে টুক করে পাশের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ রেডিওতে রিলে শুনে নিতেন।

ঘরোয়া মানুষটি : একটা সময়ে ধীরেনবাবু থাকতেন ভবানীপুরে। সেই সময় বাড়িতে তাঁর পোশাক ছিল ধুতি-পাঞ্জাবি। সে সময়টা সিগারেট, কখনও চুরুট বা মাঝে মাঝে পাইপ টানতে টানতে বাড়ি ফিরতেন। ইজিচেয়ারটা ছিল পছন্দের জায়গা। সেখানে গা এলিয়ে গড়গড়াও টানতেন, ওঁর শ্বশুরমশাইয়ের স্টাইলে। পরের দিকে পোশাক এবং নেশা দুই-ই বদলে যায়। পরতেন কোট-প্যান্ট। বাড়িতে গায়ে থাকত গাউন। নেশা হিসাবে বেছে নেন নস্যিকে। ধীরেনবাবুকে স্যার বলে সম্বোধন করলেও ওঁর স্ত্রীকে বলতাম মাসিমা। ভারি স্নেহময়ী মানুষ ছিলেন। মাসিমা ছিলেন ঘোর নস্যিবিরোধী। কড়া নজরদারিতে রাখতেন। স্বাভাবিক, এটাও তামাক এবং ক্ষতিকর। আমি গেলে তাই আমাকে চুপিচুপি নস্যির ডিবেটা হাতে ধরিয়ে দিতেন। এখন কেউ নস্যি নেয় কিনা জানি না। তখন অনেককেই নিতে দেখতাম। সরু লম্বাটে ধরনের টিনের কৌটোয় পাওয়া যেত নস্যি। ‘এন সি নস্য’ কোম্পানির নাম মনে আছে। আর কারও ছিল কিনা জানি না। এখন পানপরাগের সঙ্গে যেমন থাকে, তেমন ওই বড় ডিবে থেকে ছোট্ট চামচে করে মেপে নস্যি বিক্রি হত কাগজে মুড়ে বা ডিবে নিয়ে গেলে তাতে। অনেক নস্যিখোরের ডিবেও হত শৌখিন। যেমন, আমার বাবার একটা স্টিলের খুব সুন্দর দেখতে নস্যির ডিবে ছিল। কেউ সেটি চুরি করলে বাবা ভারি দুঃখ পেয়েছিলেন। ধীরেনবাবু বললে আমি ‘না’ করতে পারতাম না। বাধ্যত আমাকে হয়ে উঠতে হত, ওঁর গোপন নস্যি-জোগানদার।

অল্প বয়সে বাবা-মাকে হারিয়ে ছোট দুই বোনকে অপত্যস্নেহে পালন করেছিলেন। সংসারের সর্বময় কর্ত্রী

ছিলেন স্ত্রী অমিয়া। হাওড়া গার্লস কলেজের ইংরেজির অধ্যাপিকা। নিয়মিত বাজারহাট করতেন বলে সব দোকানিই তাঁকে চিনত, খাতির করত। ধীরেনবাবু তাই ঠাট্টা করে স্ত্রীকে বলতেন, 'বিধান সরণীর রানী'। বড় মেয়ে ঊশ্রীর বয়ানে, 'যাবতীয় পার্থিব ব্যাপারের দায়দায়িত্বও কিন্তু মায়ের ওপরে চাপত। বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় যখন বঙ্গোপসাগরে মার্কিন রণতরী সপ্তম নৌবহর (সেভেন্থ ফ্লিট) ঢুকে পড়েছিল, তখন বাবা তার দায় মায়ের ঘাড়েই চাপিয়েছিল। বলেছিল, 'আমি তো প্রথম থেকেই এই রকম একটা কিছু হবে ভাবছি—তুমি খালি বলতে, কিছু হবে না, কিছু হবে না। এখন সামলাও!'

বড় মেয়ে ঊশ্রী এবং ছোটমেয়ে ঊর্মী — দুজনেই অকালপ্রয়াত। বড় মেয়ে হিসাবে ঊশ্রী একটু বেশি বাবার ন্যাওটা ছিল। রাশিয়ান ভাষা শিখেছিল। রাশিয়ায় গিয়েও ছিল। পাভলভ নিয়ে লেখালিখি করেছে। ওর লেখা ইংরেজিতে একটা পাভলভের জীবনীও আছে। সেই ঊশ্রী বাবার সম্পর্কে বলছে, 'বাবা মাঝে মাঝেই সঞ্চয়িতা খুলে জোরে জোরে কবিতা আওড়াতেন। আমার একটুও ভালো লাগত না। কিন্তু বাবাই হাতে তাল দিয়ে দিয়ে 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা' কিংবা 'জলস্পর্শ করব না আর চিতোর রানার পণ' পড়ে শুনিয়ে আমার ছন্দের নেশা ধরিয়ে দিলেন। একবার আমি আর মা দু-তিন দিনের জন্য আমার দাদুম-দিদিভাইয়ের বাড়ি দমদমে থাকতে গিয়েছিলাম। তখন কারও হাতে আমি বাঁকা বাঁকা অক্ষরে বাবাকে একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। বাবা তার উত্তরে আমায় লিখে পাঠালেন— তোমার চিঠি/ মেলিয়া দিধি/ আমারে ডাকে/নীল আকাশে মেঘের ফাঁকে। চিলের পাখে।' একদম শেষকালে লিখেছিলেন, '...ভবানীপুর/অনেক দূর/একথা জেনো/পথেতে ভয়/একলা নয়/মাকেও এনো।' পেয়ারা গাছের ডালে বসে চিঠিটা পড়ে আমার খুব কান্না পেয়েছিল।'

বছর ছয়েক বয়সের বড় মেয়েকে উপহার দিয়েছিলেন 'রুশ গেরিলার কাহিনী' আর 'পেনিসিলিন আবিষ্কারের গল্প'। বৃষ্টিতে যখন কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট (পরে বিধান সরণী) ভাসত, মেয়েকে কাগজের নৌকো বানিয়ে দিতেন জলে ভাসানোর জন্য। তখন তিনি ভারতখ্যাত মনোরোগবিশেষজ্ঞ নন, ছাপোষা বাবা।

ঊশ্রীর মতে, 'আমার বাবা অসুস্থতার এক বছর আট মাস ছাড়া কখনই বুড়ো হন নি। বাবা ও বাবার বন্ধুরা, যাঁদের বলার সুবিধের জন্য আমি এককথায় বলতাম 'বাবারা'—কোনোদিনই ছেলের চাকরি, মেয়ের বিয়ে, বৌমার দুর্ব্যবহার বা গেঁটেবাতের গল্প করতেন না। নিত্য পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সঙ্গে তাল রেখে তাঁরাও ছিলেন সদাই চলমান আর বেশি মাত্রায় জীবন্ত।' ঊশ্রীর এই কথায় একটুও ভুল নেই। আমি যাতায়াত শুরু করার পরও দেখেছি, প্রতি সপ্তাহে দু-একজন বন্ধু আসতেন, তাঁরা মেতে উঠতেন নানা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে। আমি হাঁ করে শুনতাম। বলা ভালো, জ্ঞান গিলতাম।

মেয়েদের স্নেহশীল পিতা হলেও অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করতেন না। চন্দ্রিকা শর্মা নামে বাড়িতে এক অল্পবয়সী কাজের লোক ছিল। তাকে মেয়েরা বুড়ো বলে ডাকত। ছোটবেলায় তার সঙ্গে বড় মেয়ে খারাপ ব্যবহার করায় মেয়েকে তার কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করেন।

কাব্যরোগ : কাব্যরচনা নিয়ে ওঁর সাফাই ছিল এরকম: কৈশোর ও যৌবনে কবিতা লেখার প্রয়াস অনেকেই করে থাকে। আমিও করেছিলাম। বন্ধু ডাঃ গণেশ চক্রবর্তী ও পদার্থবিজ্ঞানী শৈলেন বসুর উৎসাহে 'প্রেম' মুদ্রিত হয়। প্রখ্যাত যোগেশচন্দ্র বাগলের চেষ্টায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ পত্রিকা প্রবাসীতে প্রশংসিতও হয়। বিক্রি করার চেষ্টা করা হয় নি, বিক্রিও হয় নি। বন্ধুবান্ধবদের বিয়েতে উপহার দিতে দিতে নিঃশেষিত হয়। মেডিক্যাল কলেজের তৃতীয় বছর চলছিল। নিজের কবিতা ছাপাবার জন্যই বোধহয় 'প্রবাহ' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক হই। তিন বছরে গোটাদশেক সংখ্যা কোনো মতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'শনিবারের চিঠি'র কৃপায়, মানে আক্রমণাত্মক নিন্দায়, 'প্রবাহ' পত্রিকার নাম হয়েছিল। সুকুমার সরকারের 'সুরা', 'ড্রেন', 'জুয়া' শীর্ষক কবিতা তিনটি সত্যিই ভালো কবিতা ছিল। পত্রিকার কোনো সংখ্যাই আমার কাছে নেই। কবি ধীরেন্দ্রনাথ নিজের সৃষ্টি-সংরক্ষণের তাগিদ কখনও অনুভব করেন নি। আমি দেখেছি, সে অর্থে একটু অগোছালোই ছিলেন। আমার কাজ ছিল সকাল থেকে গিয়ে টেবিল ও তাকের বইপত্র গুছিয়ে দেওয়া এবং সেই সূত্রে দুপুরে মাসিমার দৌলতে চর্ব্যচোষ্য খাওয়া। কিন্তু সেই গুছোনোর মেয়াদ অল্পদিনই থাকত। আবার সব এলোমেলো হয়ে যেত। প্রয়োজনীয় বইপত্র খুঁজে পেতেন না। আবার আমার কাজ বাড়ত। ওঁর স্ত্রী অমিয়া গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়ানে, 'কোনো কিছুর জন্য আন্তরিক দরদ তাঁর ছিল না। পত্রিকার কোনো সংখ্যার একটি কপিও তাঁর কাছে নেই।' তারপরেও নানা জায়গা থেকে জোগাড় করে ১৯৯২ সালের জুন মাসে ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কবিতা সংকলন' প্রকাশিত হয় মাসিমারই উদ্যোগে। প্রকাশিকার ভূমিকা থেকে জানতে পারি— 'লেখক কবিতা লিখেছেন ১৮ বছর বয়স থেকে ৩২/৩৩ বছর পর্যন্ত।

সংখ্যা হাজার কয়েকের কাছাকাছি। বাঙালী তরুণদের অনেকেরই কবিতা পড়া ও কবিতা লেখার আবেগ জন্মায় ১৪-১৫ বছর থেকে। তাঁরা কবিতা লেখেন নিজের তাগিদে, অতি অন্তরঙ্গ একটি বন্ধুকে পড়ে শোনানোর জন্য। তাঁদের অধিকাংশই কবি নন। লেখক সেটা বোঝেন এবং তিনি নিজেকে কবি বলে মনে করেন না। তাঁর প্রথম ঝোঁক আসে মেডিকেল কলেজে পড়ার সময়। তিনি নিজের কবিতা ছাপানোর জন্য কোনো সম্পাদকের দ্বারস্থ হন নি। 'প্রবাহ' নাম দিয়ে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করলেন, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্তের মতো নামকরা কবির কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতা ছাপালেন। এতে বোধহয় কিছুটা তৃপ্তি বোধ করেছিলেন।' এই তৃপ্তিবোধ থেকেই সম্ভবত উৎসাহিত হয়ে প্রথম কবিতার বই 'প্রেম' প্রকাশিত করেন। এর রচনাকাল মোটামুটি ১৯২৭ থেকে ৩৩। মেডিকেল কলেজের পরীক্ষার ধাক্কায় সাহিত্য পত্রিকাটির অকালমৃত্যু ঘটে। সব মিলিয়ে ৬-৭টি বের হয়েছিল। অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, প্রবোধ সান্যাল ইত্যাদি লেখকের সহযোগিতা পেয়েছিলেন। তাঁরা খুব সামান্য দক্ষিণায় লেখা দিতেন। অমিয়া জানিয়েছেন, 'কিন্তু লেখা পেলেই তো কাজ চলে না। অর্থ ও সংগঠন ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তাই 'কল্লোল', 'কালি-কলম'-এর অভাব পূরণ করতে পারে নি 'প্রবাহ'। তাঁর একজন বন্ধু ডাঃ শরদিন্দু দত্তের যত্নে-রক্ষিত পত্রিকার কপিগুলি সংগ্রহ করতে পারি নি, ডাঃ দত্তের অকালমৃত্যুর জন্য। এই পর্বের একটাই সান্ত্বনা—'প্রেম' বইটির একটি ছোট অথচ সুন্দর সমালোচনা লিখেছিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রয়াত পণ্ডিত যোগেশচন্দ্র বাগল। তবে সাল-তারিখ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিস্মৃত হয়েছেন।' দ্বিতীয় পর্বে কাব্যচর্চা চালান ১৯৩৫ থেকে ৩৮। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর চাপে, তাঁর সম্পাদিত 'উত্তরা' পত্রিকার পাতা ভরাবার জন্য। এই কবিতাগুলো নিয়েই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ছায়াপথ'। তৃতীয় পর্বে, মানে ১৯৪০ থেকে ৪৪, লেখা কবিতাগুলি নিয়ে দ্বিতীয় যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে ছাপা হয় 'লিখি ইতিহাস'। এই বইটির একটি দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল হুমায়ুন কবির সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায়। 'প্রেম' কাব্যগ্রন্থের একটু নমুনা পেশ করি। প্রথম কবিতায় লিখছেন—'আমার প্রেমের স্বপ্ন নিখিলের প্রতি অণু মাঝে,/আমার প্রেমের গীতি গ্রহ হতে গ্রহান্তরে বাজে।/বিরাট সে প্রেম মোর সৃজিয়াছে নূতন ভুবন,/তারায় তারায় বাঁধা আমার সে প্রেমের বাঁধন।...' পঞ্চম কবিতাটি ছিল এরকম— 'শোন আজ বলি তোমা সোনার মেয়ে,/আষাঢ়ে আস কি তুমি আকাশ ছেয়ে?/ বারেক আঁখির কোণে কাজল টানি/শ্যামল মেঘের বুকে তড়িৎ হানি,/আমার স্মরণ-রেখা বুকেতে পুরে/তুমি কি গাহ গো গান বাদল সুরে?/সে সুর ফেরে গো কাঁদি বাতাস বেয়ে/আষাঢ়ে তোমারে হেরি, সোনার মেয়ে!...।' দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ছায়াপথ'ও প্রেমের পদধ্বনিতে মুখর। লিখছেন, 'আজো মোর প্রেম আছে বেঁচে,—/কত দীর্ঘ রজনীর ক্লান্তি আছে আঁখির তারায়/কত স্মৃতি সুপ্তিহারা চক্রবাল রেখাতে হারায়,/কত গান আজো কাঁদে শ্রাবণের শুকানো ধারায়,/ মরুভূমে এ জীবন কত রস দেছে;/তবু মোর প্রেম আছে বেঁচে।...' তৃতীয় পর্বের কবিতায় আর প্রেম নয়। 'লিখি ইতিহাস'-এ তাই লিখছেন, 'আগামী কাল', 'জেগেছে জীবন', 'মানুষের পণ', 'লাল দাগ', 'জীবন জুয়া'র মতো কবিতা। 'লিখি ইতিহাস' শীর্ষক কবিতায় লিখছেন, 'লিখি ইতিহাস, —পুঁথির পাতাতে নয়,/মাঠ, ঘাট, পথের ওপর,—হবে না ক্ষয়;/পদচিহ্ন আমাদের যা আজ পড়ল/ঐ পথে বা ফুটপাথে। যে জীবন পড়ল, বেকারের আশা বা ভাবালুর স্বপ্ন আকাশের গায়,/লেকের জলে, কাউনটারে বা লেজারে বা ভাঙা প্যাগোডায়;...'। কবিতা থেকে পরিষ্কার প্রেমের ভাবালুতা থেকে তাঁর মন পথ ধরেছে মার্ক্সীয় ভাবনার।

নাট্যপ্রেম : দ্বিতীয় প্রেম ছিল নাটক। ছোটবেলায় নাকি সাঁতরে নদী পেরিয়ে পাশের গ্রামে যেতেন নাটকের মহড়া দেখতে। এই নাট্যপ্রেম তৈরি হয়েছিল শৈশবেই। দেখাশোনা-করা গণাদাদার কাঁধে চড়ে যাত্রা-থিয়েটারের আসরে হাজির হতেন, মহড়া দেখতেন।

১৯৫৮ সালে পাভলভ ইনস্টিটিউটের রজতজয়ন্তী বর্ষ পালিত হয়। লোকের বক্তৃতা শোনায় অনীহা। তাই প্রথমে ঠিক হয়েছিল বক্তব্যকে নাট্যরূপ দিয়ে মিনিট কুড়ির নাটিকা মঞ্চস্থ করা হবে। সেই মিনিট কুড়ির নাটিকা বাড়তে বাড়তে পুরোদস্তুর তিন ঘণ্টার পূর্ণাঙ্গ নাটকের চেহারা নেয়। বাড়িতে শুরু হয় মহড়া। ডা: সন্তোষ দাস, ডা: সন্তোষ বসুদের সঙ্গে দমদম থেকে এসে যোগ দেন শ্যালিকা সবিতা মুখোপাধ্যায়। উশ্রী ঊর্মিদের তোতাইমাসি। উশ্রী আর তুতোভাই খোকন হয়ে ওঠেন প্রম্পটার। ৫৮-র ডিসেম্বরে রঙমহল থিয়েটার হলে পাভলভ ইনস্টিটিউট নাট্যসংস্থার ব্যানারে মঞ্চস্থ হল প্রথম নাটক 'সম্রাট'। তারপরে একে একে 'মরুঝঞ্ঝা', 'যুগান্ত', 'লেনিন সরণী' ইত্যাদি। পরে 'অপারেশন ফাউস্টাস'-এর মতো নাটককে শ্রুতিনাটক করেও বিভিন্ন জায়গায় মঞ্চস্থ করা হয়েছে। এই নাটকের সূত্রেই পেয়েছেন গিরিশ পুরস্কার।

(পরের সংখ্যায়) উমা

মৃত্যুর সময় ও শংসাপত্র

ভবানীপ্রসাদ সাহু

আমাদের সবার জন্মের সময় অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে যে অপ্রিয় কিন্তু অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় তা হল—ভবিষ্যতে এই শিশু কোনোদিন মারা যাবে। 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে...!' জন্ম ও মৃত্যুর এই দুই ঘটনার মধ্যে নানা দিক থেকেই নানা ধরনের পার্থক্য রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে উভয়ের সঠিক সময় নির্ধারণ।

মাতৃগর্ভ তথা মায়ের শরীর থেকে একটি শিশু যখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়, তখন সেটি তার জন্ম সময়। একে মিনিট-সেকেন্ড পর্যন্ত নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা যায়।

কিন্তু মৃত্যুর সময়টা তা নয়। নেহাৎ কোনো দুর্ঘটনায় কারোর শরীর থেকে মাথা আলাদা হয়ে গেলে বা সরাসরি মস্তিষ্ক বা হৃদপিণ্ডে গুলি বা ঐ ধরনের আঘাত লেগে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হলে আলাদা কথা। এ ধরনের মৃত্যুর ক্ষেত্রে তবু মৃত্যুর সময়টা সঠিকভাবে বলা যায়। কিন্তু ঘরে বা হাসপাতালে কিংবা রাস্তাঘাটেও কোনো অসুস্থতা থেকে মৃত্যুর মতো বেশিরভাগ মৃত্যুর ক্ষেত্রে মৃত্যুর সঠিক সময় নিখুঁতভাবে বলা মুস্কিল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের বইতেই বলা হয়— 'কোনো পদ্ধতিতেই মৃত্যুর সঠিক সময়টি সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, এবং মৃত্যুর সময়ের একটি কাছাকাছি সীমারেখার আভাস দেয়া যায়।' * এর কারণ, মৃত্যু পরবর্তী শারীরিক পরিবর্তনগুলি ব্যক্তিবিশেষে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রভাবে বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়।

আদিম মানুষের কল্পনায় প্রাণের পেছনে 'আত্মা' জাতীয় একটা কিছুর অস্তিত্বকে ভাবা হয়েছিল। মৃত্যুর অর্থ ভাবা হত শরীর থেকে এই আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনাটিকে। বহু শত বছরের কল্পনায় এটি পরিমার্জিত ও বিকশিত হতে হতে নানা ধর্মগ্রন্থেও তা স্থান পেয়েছে। এখনো বেশ কিছু মানুষ এই কাল্পনিক ও অস্তিত্বহীন আত্মায় বিশ্বাস করলেও, চিকিৎসাবিজ্ঞানগতভাবে, মৃত্যুর সঙ্গে এই আজগুবি আত্মার কোনো সম্পর্কের কথা বলা হয় না। মৃত্যু মানে 'প্রাণবায়ু' বেরিয়ে যাওয়াও নয়। বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৃত্যুর অর্থ,— যে অসংখ্য জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শরীর প্রাণবান থাকে, তা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই বন্ধ হয়ে যাওয়া হঠাৎ হয় না, ঘটে বেশ কিছু সময় নিয়ে। তাই মৃত্যু কোনো ঘটনা (ইভেন্ট) নয়, তা একটি প্রক্রিয়া (প্রসেস)।

মৃত্যু বলতে সাধারণত অঙ্গজ (সোমাটিক) বা চিকিৎসাগত (ক্লিনিক্যাল) মৃত্যুর কথা বলা হয়। এর অর্থ হচ্ছে শরীরে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বাস ও মস্তিষ্কের কাজ—এই তিনটির (বিশপ্‌স্ ট্রাইপড অব লাইফ) কাজ সম্পূর্ণভাবে ও অপরিবর্তনীয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়া, যখন কোনোভাবেই আর এইসব কাজকে চালু করা যায় না। কিন্তু পাশাপাশি এটিও সত্যি যে, মৃত্যুর কোনো সুনির্দিষ্ট আইনসঙ্গত সংজ্ঞা নেই। আগে একসময় শুধু হৃদপিণ্ডের কাজ ও শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়াকেই সাধারণভাবে মৃত্যু বলে ভাবা হত। কিন্তু অনেক সময় শুধু এ দুটি কাজ আপাতভাবে বন্ধ হয়ে থাকলেও যদি মস্তিষ্কের মৃত্যু (ব্রেন ডেথ) না হয়ে থাকে, তবে বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলি আবার চালু হয়ে গেলেও যেতে পারে। তা ছাড়া আধুনিক কালে, কৃত্রিমভাবে হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ চালু রাখার যান্ত্রিক পদ্ধতি (হার্ট লাং বাইপাস মেশিন) এসে যাওয়ার ফলেও শুধু ঐ দুটির কাজ বন্ধ হওয়াকেই মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট লক্ষণ বলে ধরার ব্যাপারটি পাল্টে গেছে। এ কারণেই ব্রেন ডেথ-এর নতুন ধারণাটিকে চিকিৎসা বিজ্ঞানসম্মতভাবে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে।

ব্রেন ডেথ বা 'মস্তিষ্ক মৃত্যু' তিন ধরনের হতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে গুরুমস্তিষ্ক বা সেরিব্রামের মৃত্যু। এতে ব্রেনস্টেম ঠিক থাকে, শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকে। কিন্তু রোগী গভীর অজ্ঞান অবস্থায় (কোমা) থাকে। কোনো অনুভূতি গ্রহণ বা অনুভবও করতে পারেন না। মস্তিষ্কের আঘাত বা কোনো দূষণ থেকে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। দ্বিতীয়টি হচ্ছে ব্রেন স্টেম-এর মৃত্যু, কিন্তু সেরিব্রাম ঠিক থাকে এবং ব্রেন স্টেম-এর সঙ্গে তার কোনো সংযোগ থাকে না। আমাদের মাথার খুলির একেবারে নীচের ও পেছনের সামনে, মস্তিষ্কের শেষ অংশ হচ্ছে ছোট আকারের এই ব্রেন স্টেম। তুলনামূলকভাবে আকারে ছোট হলেও, এই ব্রেনস্টেমই আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তচাপ—এসবের নিয়ন্ত্রক এবং

* The Essentials of Forensic Medicine and Txicology; Dr. K.S. Narayan Reddy & Dr. O.P. Murty; 2014

শরীরের বাকি অংশের সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ ঘটে এরই মাধ্যমে। ব্রেনস্টেমের মৃত্যুর ফলে রোগী গবীর অজ্ঞান অবস্থায় (কোমা) থাকতে পারে, কিন্তু আর কোনোভাবে জ্ঞান ফিরে আসে না, নিজে থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার কাজও বন্ধ হয়ে যায়। মস্তিষ্ক মৃত্যুর তৃতীয় ধরন তথ্য পরিপূর্ণ মস্তিষ্কমৃত্যু বা 'হোল ব্রেন ডেথ'-এ গুরুমস্তিষ্ক (সেরিব্রাম), লঘুমস্তিষ্ক (সেরিবেলাম) ও ব্রেনস্টেম —সবকটির কাজই স্থায়িভাবে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রেন ডেথ হয়েছে কি হয় নি তা বোঝার জন্য বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ বিচার করা হয় (যেমন ফিলাডেলফিয়া প্রোটোকল, ১৯৬৯; মিনেসোটা প্রোটোকল, ১৯৭১)। তবে সাধারণভাবে যেগুলি বিচার করা হয় সেগুলি হল— (১) শরীরের অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনো উত্তেজনায় সাড়া না দিতে পারা; (২) নিজে থেকে শ্বাস নিতে না পারা অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ অন্তত ৩ মিনিট, কারো মতে ৪ মিনিট; (৩) মাংসপেশী শিথিল ও কোনো নড়াচড়া না হওয়া; (৪) চোখের মণি (পিউপিল) স্থির ও প্রসারিত এবং পাশ থেকে আলো ফেললেও অপরিবর্তিত থাকা; (৫) চোখে তুলো ঠেকালেও চোখের পাতা না নড়া; (৬) মাথা ঘোরালেও চোখ স্থির থাকে; (৭) ঘাড়ে, মুখে জোরে চিমটি কাটলেও চোখের মণি স্থির থাকে; (৮) গলার ভেতরে কিছু দিয়ে স্পর্শ করলেও কোনো প্রতিক্রিয়া না হওয়া; (৯) কানের ভেতরে বরফ জল দিলেও চোখের কোনো পরিবর্তন না হওয়া ইত্যাদি।

ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে 'ব্রেন ডেথ'-এর যে সুনির্দিষ্ট লক্ষণ অনুসরণ করা হয় তা হল 'হার্ভার্ড ক্রাইটেরিয়া'। এতে বলা হয়— (১) সবচেয়ে বেদনাদায়ক কোনো উত্তেজনাতেও কোনো প্রতিক্রিয়া না হওয়া; (২) অন্তত এক ঘণ্টা ধরে মাংসপেশীর কোনো ধরনের নড়াচড়া বন্ধ থাকা এবং যন্ত্রণা, স্পর্শ, শব্দ বা আলোর উত্তেজনায় সাড়া না দেওয়া; (৩) এক ঘণ্টা ধরে কোনো শ্বাসপ্রশ্বাস না নেওয়া; রোগী যদি ভেন্টিলেটর-এ থাকে তবে তিন মিনিট কৃত্রিম শ্বাসের ব্যবস্থা বন্ধ করার পরও রোগী নিজে থেকে শ্বাস নিতে বা শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করতে পারছে না; (৪) চোখের মণি (পিউপিল) স্থির ও প্রসারিত এবং পাশ থেকে তীব্র আলো ফেললেও কোনো প্রতিক্রিয়া না হওয়া; চোখের পাতা ও চক্ষুগোলক স্থির; সংশ্লিষ্ট সমস্ত ধরনের প্রতিবর্তী ক্রিয়া নষ্ট হয়ে যাওয়া; (৫) মস্তিষ্কের তড়িৎ পরীক্ষা (ইইজি) প্রতিক্রিয়াহীন (আইসো-ইলেকট্রিক)। অস্ট্রেলিয়া-জার্মানির বিশেষজ্ঞরা এগুলির সঙ্গে ভার্টিকাল আর্টারি ও গলার কাছে থাকা ইন্টারন্যাল ক্যারটিড আর্টারির অ্যাঞ্জিওগ্রাফির কথাও বলেন। ১৫ মিনিট ধরে নেতিবাচক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি মৃত্যুর প্রমাণ হিসেবে ধরা হয়।

ব্রেন ডেথ-এর মোটামুটি নিখুঁত সময় নির্ধারণের ব্যাপারটি অঙ্গ সংস্থাপনের প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মৃত্যুর কত ঘণ্টা পরে ঐ সংস্থাপন করা যাবে তা সুনির্দিষ্ট। যেমন কর্ণিয়া (অর্থাৎ তথাকথিত 'চক্ষুদান') নিতে হয় মৃত্যুর পরবর্তী ছয় ঘণ্টার মধ্যে; চামড়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে; অস্থি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ও রক্তবহা নালী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে। অন্যদিকে কিডনি, হার্ট, লাং, প্যানক্রিয়াস, লিভার— এই সব অঙ্গ রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব মৃতদেহ থেকে সংগ্রহ করতে হয়, কারণ এরা দ্রুত নষ্ট হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নবজাত শিশু থেকে ৭০ বছরেরও বেশি বয়সী ব্যক্তিরাও কর্ণিয়া দিতে পারেন। অন্যদিকে কর্ণিয়া ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ সংস্থাপনের জন্য মৃতব্যক্তির ব্রেনডেথ-এর পর হৃদপিণ্ড তখনো কাজ করছে— এই অবস্থায় নিলেই সবচেয়ে ভালো কাজ হয়।

মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পরে কিছু মাংসপেশীর সংকোচন সম্ভব এবং তা অনেক সময় 'মৃত্যু ঘোষণা করার পরও রোগী বেঁচে আছে' জাতীয় ভুল ধারণার সৃষ্টি করতে পারে। যেমন পায়ে হাঁটুর প্রায় দশ সেন্টিমিটার উপরে ঊরুর সামনের মাংসপেশীতে টোকা দিলে হাঁটুর চাকতি হাড় (প্যাটেলা) ওপরে উঠে যেতে পারে, মৃত্যুর পরেও এক থেকে দু'ঘণ্টার মধ্যে। মৃত্যুর ৪-৫ ঘণ্টার মধ্যে হাতে বাইসেপস মাংসপেশীতে ছুরির বাঁটের পেছনের কোনো ভোঁতা জায়গা দিয়ে সজোরে আঘাত করলে স্থানীয় মাংসপেশী ফুলে উঠতে পারে। এমন কি তা ২৪ ঘণ্টা পরেও থাকতে পারে। তবে আস্তে আস্তে আপনা থেকেই চলে যায়। কোনো মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর কোনোভাবে এইসব মাংসপেশীতে চাপ লাগার কারণে এইভাবে মাংসপেশী নড়লে তা ফুলে গেলে মনে হবে, রোগী বুঝি বেঁচেই আছে।

এমন ধারণা সৃষ্টি হয় বাইগার-মার্টিস রাখার কারণেও। মৃত্যুর পরপরই মাংসপেশীর বিভিন্ন কোষের মৃত্যু ঘটতে থাকে এবং এটি ঘটে মাংসপেশীতে শক্তিসরবরাহকারী পদার্থ অ্যাডেনোসিন ট্রাই ফসফেট (এটিপি) কমার জন্য। এর ফলে মাংসপেশী শক্ত হতে থাকে, আকারেও কিছুটা ছোট হয়। এটি ঘটে মৃত্যুর এক থেকে দুই ঘণ্টা পর থেকে। তখনো হঠাৎ মনে হতে পারে কোনো হাত বা পা বুঝি নড়ে উঠল। আর তখন মৃত হিসেবে ঘোষণা করা ব্যক্তির বন্ধবান্ধব

আত্মীয়পরিজন দেহ নিয়ে হাসপাতালে ফিরে এসে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করে— জীবিত ব্যক্তিকে মৃত হিসেবে ঘোষণা করার অভিযোগে। বাস্তবে এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে এবং মনে হয় প্রতি চিকিৎসকের জীবনে এক-আধবার এমন অভিজ্ঞতা হয়েই থাকে।

রাইগর মর্টিসে শরীরের ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক—সমস্ত ধরনের মাংসপেশীই প্রভাবিত হয়। হৃদপিণ্ডের মাংসপেশী দিয়ে শুরু, তারপর চোখের পাতা, মুখের ও গলার মাংসপেশী, ধীরে ধীরে ক্রমশ হাতের ও পায়ের। সবশেষে শক্ত হয় হাতের ও পায়ের আঙ্গুল। ১২ ঘণ্টা পর থেকে আবার রাইগর মর্টিস চলে যেতে থাকে এবং গরম কালে আমাদের দেশে ১৮-৩৬ ঘণ্টা পরে, শীতকালে ২৪-৪৮ ঘণ্টা পরে এটি সম্পূর্ণ চলে যায়। তবে পারিপার্শ্বিক আর্দ্রতা, উষ্ণতা, মৃত্যুর কারণ, বয়স ইত্যাদি নানা কারণে এই সময়কাল ভিন্ন হতে পারে। উল্লেখ্য ৭ মাসের কমবয়সী ভ্রূণের মৃতদেহে রাইগর মর্টিস হয় না এবং শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে দুর্বলভাবে, কিন্তু দ্রুত ঘটে। সুস্থ পূর্ণবয়স্কদের ক্ষেত্রে তা ধীরে ধীরে ঘটলেও সুস্পষ্টভাবে ও দীর্ঘক্ষণ দেখা যায়। তুলনামূলকভাবে বিরল হলেও, রাইগর মর্টিসের মতো মৃতদেহের আরেক ধরনের শক্তভাব দেখা দেয়, যাকে বলা হয় 'ক্যাডাভেরিক স্প্যাজম'। আকস্মিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে এটি দেখা যায় এবং মৃত্যুর মুহূর্তে শরীর যে অবস্থায় ছিল প্রায় হুবহু ঐ অবস্থায়, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শরীর শক্ত হয়ে যায়। খুন, আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এটি ঘটে থাকে। ঘোড়সওয়ার সৈন্য গুলি খেয়ে মৃত্যুর পর ঘোড়ার উপরেই বসে থাকতে পারে। হাস্যরত অবস্থায় বোমার আঘাতে মৃত্যু হলে মুখের মাংসপেশীর ঐ সংকোচন অর্থাৎ হাসি মুখটাই থেকে যায়। আলিঙ্গনাবদ্ধ প্রেমিক যুগল সায়ানাইড খেয়ে একযোগে আত্মহত্যা করার পর ঐ অবস্থাতেই দুজনের শরীর শক্ত হয়ে থেকে যেতে পারে। মুখের কাছে চায়ের কাপ নেওয়া অবস্থায় বোমার আঘাতে মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর দেখা গেছে উঁচু করা হাতে ঐ চায়ের কাপ তখনো ধরা আছে।

মৃত্যুর পর রাইগর মর্টিস শুরু হওয়ার আগে, রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হওয়ার কারণে আরেকটি যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে, তাকে বলা যায় 'ক্যাডাভেরিক লিভিডিটি'। দেহের যে অংশটি নীচের দিকে থাকে সেখানে ঘন কালচে লাল জমাট বাঁধা রক্তের ছোপ দেখা দেয়। মৃত্যুর আধঘণ্টার মধ্যেই হাল্কা লাল ছোপ পড়তে থাকে। এক থেকে চার ঘণ্টার মধ্যে এগুলির রঙ ঘন হয়ে আকারে বড় হয়ে যায়।

এইভাবে মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে শরীরের নানা অঙ্গের কোষ-কলার মৃত্যু ঘটার কারণে পরপর ঐ মৃতদেহের নানাবিধ পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং সবগুলি একসঙ্গে ঘটে না। এই ধরনের নানা লক্ষণ বিচার করেই মৃত্যুর আনুমানিক একটি সময় নির্ধারণ করা হয়। এই সময় তুলনামূলকভাবে কিছুটা সঠিকভাবে করা যায় পোস্টমর্টেম-এর সাহায্যে যখন শরীরের বাইরের ও ভেতরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরীক্ষা করা হয়, প্রয়োজন হলে ব্যবচ্ছেদ করে। কিন্তু সাধারণভাবে একজন চিকিৎসক যখন মৃত্যুর শংসাপত্র অর্থাৎ ডেথ সার্টিফিকেটে যে সময়ের উল্লেখ করেন তা অনেকটাই আনুমানিক এবং মূলত পাশের লোকজন আত্মীয়স্বজন বা হাসপাতালের কর্মচারীর বিবৃতির উপর নির্ভর করে। লিভিডিটি, বিশেষ করে রাইগর মর্টিস দেখে মৃত্যুর কাছাকাছি সময়ের কথা বলা যায়। অন্যথায় চিকিৎসকের প্রধান কাজ থাকে সত্যিই মৃত্যু হয়েছে কিনা তা সুনিশ্চিত করা। এর জন্য রাইগর মর্টিস শুরু হওয়ারও আগে (অর্থাৎ মৃত্যুর এক-দু'ঘণ্টারও আগে) পরীক্ষা করে দেখা হয় শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে কিনা, হৃদপিণ্ড সচল কিনা ও নাড়ি (পালস্) পাওয়া যাচ্ছে কিনা (তার জন্য গলার কাছে বড় ধমনী, ক্যারটিড আর্টারির পালসও দেখা হয়), চোখের মণি স্থির, প্রসারিত ও আলো, স্পর্শ ইত্যাদিতে প্রতিক্রিয়াহীন কিনা, মাংসপেশী শিথিল ও প্রতিবর্তী ক্রিয়া (রিফ্লেক্স)-র প্রতি নিষ্ক্রিয় কিনা ইত্যাদি। এসবগুলি দেখার বিস্তারিত পদ্ধতিও রয়েছে।

এসবের পরেও মৃত্যু সুনিশ্চিত জানলে শংসাপত্র দেওয়া হয়। কিন্তু প্রচলিত একটি নিয়ম হচ্ছে মৃত্যুর চার ঘণ্টা পরে এই শংসাপত্র দেওয়া হয়, যা দেন একজন অনুমোদিত চিকিৎসক। আর এই শংসাপত্র অর্থাৎ ডেথ সার্টিফিকেটে চিকিৎসক মৃত্যুর যে সময়টি উল্লেখ করেন, সেটিই মৃত্যুর আইনসম্মত সময়। মৃত্যুর অন্য দু'ধরনের সময়ের কথা বলা হয়, যেমন (১) শারীরবৃত্তীয় মৃত্যু (ফিজিওলজিক্যাল ডেথ)-এর সময়, যখন শরীরের অত্যাবশ্যক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া (হৃদপিণ্ড তথা রক্তসঞ্চালন, ফুসফুস তথা শ্বাসপ্রশ্বাস এবং মস্তিষ্ক) স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়; (২) মৃত্যুর সম্ভাব্য সময় যা পোস্টমর্টেম তথা অটোপসি করে বলা হয়।

কিন্তু চিকিৎসকের বলা আইনের চোখে মান্য যে সময়টির কথা ডেথ সার্টিফিকেটে উল্লেখ করা হচ্ছে, ঐ সার্টিফিকেট অর্থাৎ মৃত্যুর শংসাপত্র কেন মৃত্যুর চার ঘণ্টা পরে লিখিতভাবে দেওয়া হবে তার পেছনে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। কোনো রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার বা চিকিৎসক

সংগঠনই সরকারিভাবেও কখনো এইভাবে মৃত্যুর শংসাপত্র দেওয়ার কথা বলে নি। এটি একটি প্রচলিত সাধারণ নির্দেশিকা বা চিকিৎসকের নিরাপত্তার কারণে সুবিধাজনক ব্যবস্থা। একজন চিকিৎসক ঐ শারীরবৃত্তীয় মৃত্যুর সময়টি মোটামুটি নির্ধারণ করেন। কিন্তু কেন তার শংসাপত্র চার ঘণ্টা পরে দেওয়া হবে, এর উত্তরে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের এক স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বললেন, মৃত্যুর চার ঘণ্টার মধ্যেও আত্মা ফিরে আসতে পারে; বাই চান্স যদি সে ফিরে এসে মৃত শরীরটায় ঢুকে তাঁকে বাঁচিয়ে দেয় তাই এই কালক্ষেপ। কিন্তু আত্মার অবিতর্কিত অস্তিত্বহীনতার জন্য এই গাঁজাখুরি তত্ত্বটি নির্দ্বিধায় বাদ দেওয়া যায়। তবে শুধু ঐ চিকিৎসক নয়, আরো অনেকেই এমন বিশ্বাস পোষণ করেন। আরেকজন বললেন, মৃত্যুর পরে হৃদপিণ্ডের তাড়িতিক ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে চার ঘণ্টার মতো সময় লাগে। তাই হঠাৎ যদি কোনোভাবে তা ফিরে এসে রক্তসঞ্চালন শুরু করে তাই এই সতর্কতা। কিন্তু এরও কোনো বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ নেই। দুর্ঘটনায় মস্তিষ্ক মৃত্যুর পর বেশ কিছুক্ষণ হৃদপিণ্ড সক্রিয়া থাকতে পারে—অর্থাৎ যেন 'মৃত ব্যক্তির সচল হৃদপিণ্ড'। অঙ্গ সংস্থাপনের এটিই আদর্শ সময়। কিন্তু পরিপূর্ণ মস্তিষ্ক মৃত্যু বা ব্রেন ডেথ-এর পর হৃদপিণ্ডও ধীরে ধীরে থেমে যায়। তাকে ঐ সময় অন্যের শরীরে প্রতিস্থাপিত করা যায় এবং তা কাজও করতে পারে। কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে বাঁচাতে পারে না, কারণ মস্তিষ্কের যে নির্দেশিকায় সে কাজ করে সেটিই আর ফিরে আসে না। ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু এই স্তব্ধতার সময়টি কখনোই চার ঘণ্টা নয়। বড় জোর ঘণ্টাখানেক; এক ঘণ্টার মধ্যেই প্রথম রাইগর মর্টিস শুরু হয় হৃদপিণ্ডের মাংসপেশীতে। তাই মৃত্যুর ব্যাপারটি সুনিশ্চিত হওয়ার এক ঘণ্টা পরে মৃত্যুর শংসাপত্র বা ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়াই যায়। প্রকৃতপক্ষে কর্ণিয়া দানের ক্ষেত্রে এই সময়টি গুরুত্বপূর্ণ।

শারীরবৃত্তীয় মৃত্যুর ছয় ঘণ্টা পর কর্ণিয়া নষ্ট হতে শুরু হয়। যিনি 'চক্ষুদান' করেছেন তাঁর এই মৃত্যুর চূড়ান্ত সঠিক সময়টি কোনো ক্ষেত্রেই নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা যায় না। ফলে মোটামুটি একটি সময় ধরে নিয়ে তার চার ঘণ্টা পরে ডেথ সার্টিফিকেট পেয়ে তারপর কর্ণিয়া দিতে গেলে অনেক সময়ই দেখা যায় ছয় ঘণ্টা সময় পেরিয়ে গেছে। তাই চক্ষুদাতার সেই মানবিক ইচ্ছাটিকে আর সম্মান দেওয়া যায় না। এই কারণে অঙ্গদান তথা চক্ষুদান-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংগঠন নিশ্চিত মৃত্যুর এক ঘণ্টা পরে শংসাপত্র দেওয়া তথা মৃতদেহকে আত্মীয় পরিজন বন্ধুবান্ধবের হাতে দেওয়ার আবেদন করে আসছিলেন।

এসবেরই ফলশ্রুতিতে ২৪ আগস্ট, ১৯৯৯ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দপ্তরের মুখ্য নির্বাহ আধিকারিক (প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি)-র পক্ষ থেকে একটি নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক কোনো ব্যক্তির মৃত্যু নিশ্চিত করার পর মৃত্যু শংসাপত্র (ডেথ সার্টিফিকেট) এই সময় দিয়েই প্রস্তুত করবেন এবং মৃত্যুর ঐ সঠিক সময়ের ঠিক এক ঘণ্টা পর তা মৃতের আত্মায়স্বজনের হাতে দেবেন। এ প্রসঙ্গে এটিও উল্লেখ্য যে, এই নির্দেশিকার আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যশিক্ষা অধিকর্তা এক বিশেষজ্ঞদলের বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী একই অভিমত ১৩ আগস্ট (১৯৯৯) রাজ্যসরকারকে জানান, রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্যপরিষেবা আধিকারিকও তা অনুমোদন করেন এবং তার ১০-১২ দিন পরেই এমন একটি ঐতিহাসিক সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়। *

সব মিলিয়ে মৃত্যুর চারঘণ্টা পরে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়ার ব্যাপারটার মধ্যে 'যদি অলৌকিকভাবে ঐ ব্যক্তি বেঁচে যায় তবে কি হবে' জাতীয় আতঙ্কের পাশাপাশি সমস্ত লক্ষণ বিচার করে মৃত্যু সুনিশ্চিত করার প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সম্ভাব্য ঘাটতির দোদুল্যমানতাও যথাসম্ভব কাজ করে। তা না হলে এতক্ষণ দেরি করার কোনো বিজ্ঞানসম্মত কারণ নেই। অথচ মৃত্যুর চার ঘণ্টা পেরিয়ে না গেলে ডেথ সার্টিফিকেট 'ইস্যু' করা হবে না— এই ব্যাপারটি এমনই প্রচলিত হয়ে গেছে যে, তা একটি প্রথা বা সংস্কার অর্থাৎ 'মিথ'-এর চেহারা নিয়েছে।

*** সরকারি নির্দেশিকা শ্রী স্বপন কুমার বন্ধুর সৌজন্যে সংগৃহীত।**

উ মা

কেতাব-e ketab-

উৎস মানুষের ১৯৮০ সালের প্রতিটি সংখ্যা এবং কিছু বই কেতাব-ই বাংলা পোর্টালে পাওয়া যাবে। কেতাব-ই বাংলা সাহিত্য ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের একটি প্ল্যাটফর্ম। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কাব্যের যে বিপুল সম্ভার বাংলায় রয়েছে, তাকে পাঠকের কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়াই এই প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্য।

স্বচিকিৎসা পর্ব ১০

তস্য পর্ব ঃ বার্ধক্য ৫

গৌতম মিস্ত্রী

কিছু শারীরিক কষ্ট একটু অন্যরকমের—অন্যরকম তার কারণ আর তার সমাধান। বেশ কিছু রোগের চিকিৎসার জন্য হাজারো রকমের ট্যাবলেট, সিরাপ, ইনজেকশন, মলম, করোনারি অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি, স্টেন্ট ইত্যাদি আছে। সেই চিকিৎসায় রোগের উপশম, রোগমুক্তি ইত্যাদি মিললেও অন্য কিছু রোগের রোগলক্ষণ সর্বোত্তম চিকিৎসা সত্ত্বেও থেকে যায়। সেটা অবহেলার যোগ্য নয়। সেই রোগের নাম বার্ধক্য। যার সমাধানের জন্য এখনও কোনো ম্যাজিক ওষুধ আবিষ্কার করা যায় নি। সেই কষ্টের 'না-অসুখ' বা বার্ধক্য মানব শরীরের এক প্রাকৃতিক অমোঘ অন্তিম অবতার। তার নিরাময়ে কোনো ম্যাজিক ট্যাবলেট কাজে লাগে না। বার্ধক্য তো আর কোনো রোগ নয়। বার্ধক্য হল অসুখের এক 'না-রোগ-অবতার'-মৃত্যুর আগের এক অতি স্বাভাবিক অবস্থা যার ওষুধ থাকতে নেই। কেমনে তার মোকাবিলা করা যায়? আসুন তার আলোচনায় কিছুটা সময় ব্যয় করি।

ঠুনকো আঘাতে হাড় ভেঙে কষ্টের চেয়ে বিব্রত হওয়া বুড়ো বয়সের এক উটকো ঝামেলা — পাঠশালায় অনেকে পড়েছেন, গোপাল অতি ভাল ছেলে। অতি সুবোধ বালক বলে গোপালের হাড় ভাঙে নি। আপনি তেমন সুবোধ বালক বা বালিকা না হলে আপনার হাড় কৈশোরে ভাঙে নি এমন নয়। তবে তখন শরীরে তেজ ছিল, ভাঙা হাড় জুড়ে গেছে বটে। হয়ত সেই ঘটনা এখন বিস্তারে বলা আপনার প্রিয় বিষয়। কিন্তু বুড়ো হলে ভাঙা হাড় জুড়তে সময় লাগে। এই দুর্ঘটা কাউকে বলে সুখ নেই। বরং বুড়ো বয়সে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে তার জন্য পরামর্শ দিতে পারলেই বরং আনন্দ। কিন্তু কে শোনে বুড়ো ভামের সেই পরামর্শ। যাঁরা শুনতে চায় তাঁদের জন্য পরের অংশটি।

পরামর্শ ১

হাড় শক্তপোক্ত রাখা — সুদৃঢ় হাড়ের কাঠিন্য নির্ভর করে হাড়ের মধ্যের ক্যালসিয়াম নামের একটি ধাতব অণুর পরিমাণের উপরে। আজকাল হাড়ের ধাতুর (ক্যালসিয়াম) ঘনত্ব মাপজোক করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে যার একটি জনপ্রিয় পরীক্ষার পোশাকি নাম 'বোন মিনারেল ডেনিসিটি' (BMD)' পরীক্ষা।

বিড়ি বা সিগারেট পান করলে ফুসফুসের ক্যান্সার হতে পারে অবশেষে এটা জেনে আমাদের জনহিতৈষী বাহাদুর সরকার বিড়ি-সিগারেট প্রস্তুতকারক ব্যবসায়ীদের বলে কয়ে সিগারেটের প্যাকেটে ক্ষুদ্র হরফে জানাতে বাধ্য হয়েছেন, তাঁদের ব্যবসার খাতিরে বিষ বিক্রি করতে হচ্ছে, আর আমাদের সবার ফুসফুসের সুস্থতার সাথে আপোস করতে হচ্ছে। ফুসফুসের ক্যান্সার মারাত্মক ও নিজের মৃত্যুর সাথে সাথে পরিবারকে একটা বড় আঘাত দেয় জেনেও ধূমপান চালিয়ে যাওয়া আর ঘনঘন ক্যান্সার হল কিনা তার জন্য এক্স-রে, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি পরীক্ষা অর্থহীন। এমনটাই হয়ে থাকে কিছু আধা-সচেতন ধূমপায়ী মানুষের জীবনে। যেহেতু ধূমপানের বদ অভ্যেস ছাড়তে পারছেন না, তাই তাঁদের অনেক ঘনঘন পরীক্ষা করে থাকেন তার ফুসফুসে সত্যিই ক্যান্সার হল কিনা। ফুসফুসের ক্যান্সারের মধ্যে সংখ্যাগুরু ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা যেটা প্রধানত ধূমপানের জন্যই শরীরে বাসা বাধে। ট্র্যাজেডি এই যে, সচ্ছল আর আসক্ত ধূমপায়ী এক মাস আগের ফুসফুসের পরীক্ষা ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্ভাবনা হয় নি জেনে আর এক কার্টুন সিগারেট কিনে এনে ফুসফুসে বিষবাষ্প ঢুকিয়ে পরের মাসে ফুসফুসের পরীক্ষায় ডাহা ফেল করতেই পারেন। ফুসফুসের ক্যান্সারের বীজ বপন থেকে তার মারণ ক্ষমতায় আত্মপ্রকাশের জন্য এক মাস সময় প্রয়োজনের চেয়ে অতি লম্বা সময়। ঘনঘন এক্স-রে করার একটা অন্তিম সীমা আছে। আর যাই হোক এক্স-রে পরীক্ষার বিকিরণ নিজেই একটা ক্যান্সার রোগের সম্ভাবনা নিয়েই আমাদের সামনে হাজির হয়। সিটি স্ক্যানও তাই। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে কাবু, অথচ প্রখর বুদ্ধিমান টিকে যায় তার অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতায়। তার একমাত্র উপায় সিগারেটের প্যাকেটের স্বাস্থ্যসম্মত সতর্কীকরণ উপেক্ষা না করা। নির্বোধ নন কিন্তু অসচ্ছল ও কিছু সচ্ছল বুদ্ধিমান মানুষ এবং সিগারেট খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। তেমনই আপাত সুস্থ প্রৌঢ় মানুষের 'বোন মিনারেল ডেনসিটি' পরীক্ষা অপ্রয়োজনীয়। হাড়ের ক্যালসিয়াম যথাযথ পরিমাণে রাখার চেষ্টা করাটাই পর্যাপ্ত ও সস্তার। কী সেই প্রচেষ্টা?

বজ্রকঠিন হাড়ের দৃঢ়তা --- হাড়ের দৃঢ়তা হাড়ের ক্যালসিয়াম নামের ধাতব পদার্থের উপযুক্ত পরিমাণের উপস্থিতির উপরে নির্ভরশীল। হাড় শক্তপোক্ত রাখার প্রচেষ্টায় দুটো প্রয়োজনীয় বিপরীত ক্রিয়া চলতে থাকে—হাড়ের পুরনো

ক্যালসিয়াম বর্জন (bone resorption, osteoclastic action) আর হাড়ে নতুন ক্যালসিয়াম সংযুক্তিকরণ (bone formation, osteoblastic action)। নিয়ন্ত্রক প্রকৃতির (আমার আপনার বিশ্বাসের অবস্থানভেদে প্রকৃতি বা পরমেশ্বর হতে পারে, কিন্তু বক্তব্য একই) ব্যবস্থা হিসাবে পুরনো ক্যালসিয়াম বর্জন অপ্রয়োজনীয় নয় মোটেই। হাড়ের ক্যালসিয়াম বর্জনের ক্রিয়া দৈনন্দিন ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে আমাদের অবচেতনে সৃষ্ট হাড়ের আণুবীক্ষণিক ক্ষত বা চিড় খাওয়া (silent microfractures) সারিয়ে তোলার প্রাথমিক পদক্ষেপ। দ্বিতীয় ও অন্তিম ক্রিয়ায় হাড়ে নতুন ক্যালসিয়াম সংযুক্ত হয়। শরীরচর্চা না করা অলস মানুষের ক্যালসিয়াম বর্জন প্রক্রিয়া অধিক সক্রিয় হয়ে যাওয়ার ফলে হাড়ের ক্যালসিয়াম ক্রমশ কমতে থাকে। ক্যালসিয়ামের বড়ি বা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবারদাবার খেয়েও হাড়ের ক্যালসিয়াম বর্জন করার সাথে তাল মিলিয়ে হাড়ের ক্যালসিয়ামের ভাঁড়ার নবীকরণ করা যায় না। হাড়ের পুরনো ক্যালসিয়াম বর্জন আর নতুন ক্যালসিয়াম সংযুক্তিকরণের ভারসাম্য থাকা জরুরি দুটো কারণে — প্রথম কারণটা এইমাত্র উল্লেখ করলাম। আবার অধিক ও অস্বাস্থ্যকর মাত্রায় হাড়ের পুরনো ক্যালসিয়াম বর্জন হতে থাকলে, কিডনিতে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ পাথর তৈরি হয়ে যাবার সম্ভাবনাটা উদ্বেগের। হাড়ের ক্যান্সার আর কিডনিতে পাথর সৃষ্ট হওয়ার একটা কারণ হিসাবে শরীরের প্রয়োজনের হাড় থেকে অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামের বর্জন প্রক্রিয়া একটা সম্ভাবনা হিসাবে মনে করা হয়।

হাড় শক্তপোক্ত করার উপায় ঃ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন ডি ও শরীরচর্চা — হাড়ের ক্যালসিয়ামের বাড়বাড়ন্তের আশায় আধুনিক সচ্ছল মানুষ জীবনের পড়ন্ত বেলায় আজকাল নিয়মিত ক্যালসিয়ামের আর ভিটামিন ডি-এর বড়ি খান। যদিও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালসিয়ামের বড়ি খাওয়ায় ক্ষতি নেই বলে আশ্বস্ত করছেন বিশষজ্ঞ ডাক্তাররা। পেটের মধ্যে খাদ্য ও বড়ি থেকে ক্যালসিয়াম রক্তে মেশার ব্যাপারটা দেখভাল করে প্যারাথাইরইড গ্রন্থি থেকে নিঃসারিত প্যারাথরমোন নামে একটা উৎসেচক। বিনা প্রয়োজনে গাদা গাদা ক্যালসিয়ামের বড়ি খেলে পেট থেকে রক্তে সেই অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম ঢুকে পড়ার ভয় নেই। প্যারাথরমোন উৎসেচক পেট থেকে রক্তে ক্যালসিয়ামের অন্তর্ভুক্তি ব্যাপারটা দেখভাল করে।

এই আশ্বাসবাণী অবশ্য 'ভিটামিন-ডি'-র ক্ষেত্রে খাটে না। ভিটামিন ডি শরীরের রক্তরস বা জলে নয়, চর্বিতে দ্রবীভূত হয়। তাই ভিটামিন ডি-এর অবস্থাটা একটু আলাদা। জলে দ্রবীভূত হয় এমন কোনো ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি প্রয়োজনের বেশি খেয়ে ফেললে, অপ্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে শরীর থেকে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই। এ, ডি, ই আর কে শ্রেণীর ভিটামিন জলে দ্রবীভূত হয় না, চর্বিতে দ্রবীভূত হয়। ওষুধ হিসাবে ভিটামিন ডি খাবার সময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে। ভিটামিন ডি-র বড়ি, বা পাউডার অবিবেচকের মতো বেশি ফেললে একটা রোগ হয় যার নাম হাইপারভিটামিনোসিস-ডি। প্রাকৃতিক ভিটামিন ডি-এর উৎস — চর্বি সমৃদ্ধ সামুদ্রিক মাছ, ডিম আর সূর্যালোক। এটা ভরসার, প্রাকৃতিক উপায়ে মানব শরীরে ডি ভিটামিনের অন্তর্ভুক্তিতে হাইপারভিটামিনোসিস-ডি রোগের সম্ভাবনা নেই। অতিরিক্ত ভিটামিন ডি-এর বিষক্রিয়া একমাত্র অবিবেচকের মতো ভিটামিন ডি-এর বড়ি সেবনেই হয়। কী হয় এই রোগে ? বিজ্ঞজন জানাচ্ছেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটামিন ডি-এর বিষক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ক্রিয়া বিগড়ে যায়, আমাদের যুক্তিপূর্ণ চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যায়, খিদেমন্দা হয়, এমনকি বমিও হতে পারে। সঠিক পরিমাণের ভিটামিন ডি আমরা পাই আমাদের চামড়ায় সূর্যালোক থেকে প্রস্তুত ও পেট থেকে ভিটামিন-ডি সমৃদ্ধ খাদ্যের ও ট্যাবলেটের মাধ্যমে। রক্তের ক্যালসিয়াম হাড়ে অন্তর্ভুক্ত হয় হাড়ে সংযুক্তিকরণের জন্য। রক্তে ভিটামিন ডি কমে গেলে হাড় থেকে ক্যালসিয়াম বর্জনের ক্রিয়া অধিকতর সক্রিয় হয়ে হাড়ের জোর কমিয়ে দেয়।

তবুও যাঁদের চিকিৎসকের নিদান মতে বাধ্য হয়ে ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি-এর ওষুধ খেতে হবে বা খাবেন তাঁদের জন্য উল্লেখ করি, হে নিয়মিত ট্যাবলেটে নির্ভরশীল নবীন ও প্রবীণ নাগরিক, আপনি শরীরচর্চায় অপারগ বা অনিচ্ছুক হলে আর আপনার পকেটে যথেষ্ট রেস্ত থাকলেও দৈনিক ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম আর ৬০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন-ডি-এর বেশি খাবেন না। বিশ্বের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ঐক্যমতে এই চিকিৎসা পরামর্শ সুফলদায়ী কিনা সেই প্রশ্নে না গিয়ে বিশেষজ্ঞরা বলছেন অন্তত এই নিদান নিরাপদ।

অনেকেই ওষুধের উপরে একসময় ভরসা হারিয়ে ফেলেন— আঙুলে আংটি আর পায়ের বেড়ির গুণগান করেন (করুন, তাতে আপনি ছাড়া আর কারোরই ক্ষতি নেই) আর ব্যথা না কমলে অ্যালোপ্যাথি (আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসক) ডাক্তারের চোদ্দগুষ্টি উদ্ধার করেন আপনার ধারালো আধো-উচ্চারিত কটু বাক্যবাণে।

আগে উল্লেখ করলেও আর একবার বলতেই হচ্ছে—

বার্ধক্যে আমাদের হাড়ের ও অস্থিসন্ধির দুটো রোগ আমাদের বেশ বেকায়দায় ফেলে— প্রথমটা অস্থিসন্ধির বাতের রোগ বা অস্টিওআরথ্রাইটিস আর দ্বিতীয়টা ভঙ্গুর হাড়, মামুলি আঘাতে যে হাড় ভেঙে যায়। এই দুয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টা এমনিতে আমদের খুব একটা বিব্রত করে না। কেবল বেকায়দায় ক্বচিৎ কদাচিৎ আঘাত খেলে হাড় ভেঙে যায়। বুড়ো বয়সে মনে ভিড় করে এই সেদিনের, নিকট অতীতের যৌবনের প্রাণোচ্ছল নেচেকুঁদে বেড়ানোর দিনগুলির কথা। সেই মিষ্টিমধুর স্মৃতি মনে করে বর্তমানের নিজের সীমাবদ্ধতা মেনে ও বুড়ো বয়সের সংযত নিয়ম মেনে বাকি জীবনটা কাণটতে পারলে কেবল নিজেরই ভালো তা নয়, আমাদের সন্তান-সন্ততিও স্বস্তিতে থাকে। নিজের হাড় ভেঙে ছেলেমেয়ের কর্মময় জীবনে অশান্তি ডেকে আনার কোনো মানে নেই।

বৃদ্ধ বয়সের টলোমলো শরীর হাড় ভাঙার দুই শয়তানের মধ্যে একটি — বুড়ো হলে ক্যালসিয়াম কমে গিয়ে হাড় কেবল আপনিই ভাঙে না; ঠুনকো হলেও, হাড় ভাঙার জন্য আঘাতের দরকার হয়। আপনার শরীরে হয়তো ভঙ্গুর হাড়। কিন্তু আপনি সর্বক্ষণ তনু ডুবে যাওয়া নরম বিছানায় শুয়ে থাকলে আপনার হাড় ভাঙে কার সাধ্য। হাড় ভাঙার জন্য মৃদু হলেও আঘাত চাই। বুড়ো বয়সে সেই আঘাত আসে আছাড় খেয়ে, হোঁচট খেয়ে বা পা পিছলে পড়ে গিয়ে। অর্থাৎ হাড় ভাঙার জন্য দুটো আবশ্যিক পরিবেশ চাই— ১) ভঙ্গুর হাড় ও ২) টলমল করা বেসামাল তনু। বেসামাল শরীর বৃদ্ধ বয়সে হাড় ভাঙার একটা আবশ্যিক শর্ত ভঙ্গুর হাড় ও বেসামাল শরীরের টলমল অবস্থায় আছাড় খাওয়ার দুর্ঘটনা। হাঁটতে গেলেই কেমন যেন ডাইনে-বামে হেলে যাওয়ার রোগ, উঠে দাঁড়ালেই মাথা ঘুরে যাওয়ার রোগ। এই দ্বিতীয় অবস্থার জন্য আমরা খামোকা শুকনো মাটিতে আছাড় খাই, আছাড় খেয়ে ঊরুসন্ধির হাড় ও অন্যান্য হাড় ভাঙি বুড়ো হলে।

দু-পেয়ে মানুষের উলম্ব অবস্থা দৃঢ় রাখার জন্য একাধিক নজরদারির বন্দোবস্ত আছে আমাদের শরীরে। তার মধ্যে আছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। প্রতিটি উপায় অন্য দুইটি উপায়ের অভাবেও আমাদের খাড়া রাখার কাজটা আমাদের অবচেতনে করতে সক্ষম। এই তিনটি নজরদারি উপায় হল ১) দৃষ্টি ২) শ্রবণ অঙ্গের সাথে লেপ্টে থাকা ভেস্টিবুলের কাজ, যার ফলে অন্ধ মানুষও সে হেলে যাচ্ছে কিনা সেই শারীরিক অবস্থান বুঝতে পারে। আমরা চোখ বন্ধ করেও ডাইনে, বামে, সামনে বা পেছনে হেলে যাচ্ছি কিনা সেটা এই অঙ্গের কাজেই অনুভব করতে পারি, আর ৩) পায়ের চেটোর সংবেদন — আমরা হেলে পড়ে যাবার মতো অবস্থা হলে পায়ের স্নায়ু তড়িৎ গতিতে মস্তিষ্কে সংকেত পাঠায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমরা ডান দিকে হেলে গেলে ডান পায়ের পাতার বাইরের দিকের ও বাম পায়ের পাতার ভিতরের দিকের বেশি চাপের সংকেত মস্তিষ্কে পাঠায় পায়ের স্নায়ু। আমাদের মস্তিষ্ক এক লহমায় বুঝে যায় আমরা ডান দিকে হেলে যাচ্ছি। সেই তথ্য বিশ্বের সুপার কম্পিউটারের চেয়ে দ্রুতগতিতে আমাদের মস্তিষ্ক বিশ্লেষণ করে শরীরের সেই সব পেশিগুলিকে নির্দেশ পাঠায়, যেগুলোর সংকোচন ও প্রসারণে আমাদের হেলে যাওয়া শরীর আমাদের আছাড় খাওয়া থেকে রক্ষা করে। আমাদের ঠুনকো হাড় অক্ষত রেখে আমাদের ধরাশায়ী হওয়া আটকায়। শরীরের বয়স বাড়লে আমাদের দৃষ্টি কমজোরি হয়ে যায়, চশমা ইত্যাদি দিয়ে কাজ চালানোর মতো একটা উপায়ে আপোস করে নিতে হয়। ভেস্টিবুলের আর পায়ের চেটোর সংবেদনের কাজও বয়সের সাথে সাথে তার কর্মদক্ষতা হারায়। যৌবনে এই তিনটে শারীরিক উপায় আমাদের খামোকা আছাড় খাওয়া আটকে দেয়। আমাদের কোমরের ও হাতের হাড় ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। বার্ধক্যে এই তিনটি নজরদারি উপায়ের প্রত্যেকটাই কমজোরি হয়ে পড়ে। সুগারের রোগ থাকলে এই নজরদারি উপায় থুরথুরে বুড়ো হবার আগেই অকেজো হয়ে পড়ে। মানুষকে দুপায়ে খাড়া রাখার এই উপায়ে বিঘ্ন ঘটলে অঘনটন ঘটে। ভাঙা হাড় হয়তো বা জোড়া লাগে, কিন্তু শরীরের নড়বড়ে অবস্থা কোনো ওষুধে সারে না। কিছু ব্যায়াম আমাদের দুপায়ে সিধে রাখার কৌশল বজায় রাখতে সাহায্য করে পায়ের স্নায়ু ও পেশিগুলির ক্রিয়াকে সচল রেখে। এই ব্যায়ামগুলি ছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই।

বুড়ো বয়সে হেলেদুলে নয়, দৃঢ়ভাবে দুপায়ে খাড়া থাকার জন্য ব্যায়াম — ১) এক পায়ে দাঁড়ানোর ব্যায়াম। এই ব্যায়াম শুরু করার সময়ে সামনে কিছু শক্তপোক্ত ধরার হাতল, দেওয়াল ইত্যাদি দরকার। পর্যায়ক্রমে ডান ও বাম পায়ে একপায়ে দাঁড়াতে হবে। হেলে পড়ে যাবার উপক্রম হলে সামনের হাতল বা দেওয়াল ধরে নিতে হবে বা তুলে রাখা পা মাটিতে নামিয়ে ধরাশায়ী হওয়া আটকাতে হবে। কয়েকদিন অভ্যাস করলে এক মিনিট সময়ের জন্য এক পায়ে দাঁড়াতে পারা যায়। এই ব্যায়াম অন্তত বার দশেক করতে হবে প্রতিদিন। ২) মেঝেতে একটা লাইন বরাবর হাঁটতে হবে। দিশা না পেলে, মেঝেতে একটা দাগ দিতে হবে— সেই দাগ সরলরেখা না হয়ে বক্ররেখা হলে ক্ষতি নেই।

আপনাকে সেই লাইন বরাবর হাঁটতে হবে শম্বুক গতিতে। ডান পায়ের সামনে বাম পা রাখতে হবে যাতে বাম পায়ের গোড়ালি আগের পদক্ষেপের পায়ের আঙুল স্পর্শ করবে। এইভাবে হাঁটার সময়ে ডাইনে বামে হেলে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। প্রথম দিকে সেই হেলদোলের অবস্থায় বিব্রত হবার কোনো মানে হয় না। দুইদিকে প্রসারিত হাত আপনার ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করবে। আপনার সেই ব্যায়ামের সাক্ষী কোনো অর্বাচীন কৌতুকপ্রিয় দর্শকের শারীরিক ও উচ্চারিত ব্যাঙ্গোক্তিতে আপনি মোটেই দমবেন না। হলফ নিয়ে বলছি, মাসখানেক পরে আপনি সেই অকর্মণ্য আমোদপ্রিয় দর্শকদের তাক লাগিয়ে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারবেন। তাঁরা আপনার মতো না হেলে ঐ লাইন বরাবর হাঁটতে পারবেন না। যে অবস্থায় হয়তো তাঁরা আছাড় খেয়ে কোমরের বা পায়ের হাড় ভাঙবেন, আপনি মুচকি হেসে সেই অবস্থায় নেচে বেড়ানোর স্পর্ধা দেখাবেন। শেষ হাসি আপনিই হাসবেন।

শেষ বয়সের সময়ে আছাড় খাওয়ার শেষ শত্রু রাখতে নেই— এইক্ষণে আমার কথাটি ফুরানোর আগে তিনটে পরামর্শ দিয়ে যাই— ন্যূনতম বিত্তবান মানুষের ক্রমশ ছোট হতে আসা পৃথিবীর শেষ চৌহদ্দি হল ঘুমোনোর ও আলসেমিতে গা ভাসানোর জন্য বেডরুম, বেডরুমের লাগোয়া ঘরে খাবার টেবিল আর বেডরুমের আরেকদিকে লাগোয়া টয়লেট। এই ছোট্ট পৃথিবীতে এক সময়ে জীবনের পড়ে থাকা বাকি আবশ্যিক জীবনের সময়টা কাটানোর জন্য প্রস্তুত হতে হয়। আমার ও আপনার প্রয়োজন চৌকাঠবিহীন এই তিনটে কক্ষে ঢোকা ও বেরোনোর উপায় আর অমসৃণ টয়লেটের মেঝে। হে পাঠক পাঠিকা যৌবনে চেষ্টা করুন চৌকাঠবিহীন ঘরে আস্তানা গাড়তে অথবা ঘরে চৌকাঠ থাকলে যথাসম্ভব শীঘ্র চৌকাঠ বিদেয় করুন। বাথরুমের মেঝে মার্বেলের বানিয়েছেন শখ করে? সেই বজ্র আঘাত হানুন। মার্বেলের মেঝে তুলে অমসৃণ সিরামিক টালি লাগান। সিরামিক টালি খরচার হলে অন্তত সিধেসাধা সিমেন্টের মেঝে করুন মার্বেল তুলে ফেলে। সিমেন্টের মেঝে তৈরির শেষ দিনে কারিগরকে বলুন নারকেলের ছোবড়ার (কাতার) দড়ি দিয়ে বাথরুমের নরম ও মসৃণ সিমেন্টের মেঝেতে নক্সা কেটে দিক। আরও ভালো হয়, এর সাথে যদি বাথরুমের চার দেওয়ালে শরীরের ভার বয় এমন শক্তপোক্ত ধাতব পাইপ লাগিয়ে দেওয়া যায়। মাঝরাতে টয়লেটে আপনার যাতায়াত অন্য কোনো মানুষ ছাড়াই ভরসাযোগ্য হবে। এই তিনটে উপায় আপনার আছাড় খাওয়া আটকাতে অনেকটাই সক্ষম হবে।

পরিশিষ্ট ঃ বৃদ্ধ বয়সে হাড়ের দৃঢ়তা কমে যাওয়া (অস্টিওপোরোসিস) ঠেকানোর জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি যৌবনে নিয়মিত শরীরচর্চায় আসক্ত হওয়া (খেয়াল করবেন, আসক্ত বলছি, অভ্যাস নয়)। একাধিক বৈজ্ঞানিক তথ্যমতে হাড়ের দৃঢ়তা রক্ষায়, হাড়ের ক্যালসিয়ামের পর্যাপ্ত পরিমাণের উপস্থিতির জন্য নিয়মিতভাবে হাড়ে সংযুক্তিকরণ যতটা প্রয়োজন, তার চেয়েও দশগুণ প্রয়োজন হাড় থেকে ক্যালসিয়াম বর্জনের প্রক্রিয়া সীমিত রাখা। শরীররচর্চার ফলে একদিকে যেমন যথাসম্ভব হাড়ের ক্যালসিয়াম বর্জন (Bone resorption, osteoclastic action) সীমিত রাখা যাবে আবার একইসঙ্গে অস্থিসন্ধির চারপাশে ও উপর-নীচের পেশি সুস্থ সবল থেকে অস্থিসন্ধির ভার লাঘব করবে। এরপরেও যদি আরও বেশি কিছু করার ইচ্ছে হয় তবে খাদ্য ও ট্যাবলেটের মাধ্যমে (লাগাম ছাড়া বেশি নয়) উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন ডি-এর বড়ি খাওয়া যেতে পারে। মানুষের হাড়ের দৃঢ়তা রক্ষার প্রয়োজনে দৈনিক ১২০০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম ও ৮০০ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিট ভিটামিন ডি প্রয়োজন। বেশি ক্যালসিয়াম খেলে তা রক্তে মিশবে না প্যারাথোরমন নামের হরমোনের নজরদারিতে। সূর্যালোক, মাছ বা ডিম থেকে ভিটামিন ডি শরীরে আত্মস্থ করায় আস্থা না থাকলে অতি সহজে ভিটামিন ডি-এর বড়ি কিনে খেতেই পারেন। তবে সে ক্ষেত্রে মাঝেমধ্যেই রক্তের ভিটামিন ডি-এর মাত্রা নির্ণয় করে নিতে হবে যাতে আমাদের বৃদ্ধ বয়সের উৎসাহের আতিশয্যে আমাদের শরীরে বেশি ডি জাতীয় ভিটামিন নতুন রোগ (Hypervitaminosis D) সৃষ্টি না করে। ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য হিসাবে দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার বেশি জনপ্রিয়। আমার একান্ত ব্যক্তিগত মত, ক্যালসিয়ামের (তার সঙ্গে প্রোটিনও বটে!) জন্য দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার একটি নিকৃষ্ট পানীয় ও খাবার। কারণ দুধ, দই, ছানা, পনির ইত্যাদি খাদ্য-পানীয়ের সঙ্গে ভেজাল হিসাবে খেতে ও পান করতে হয় সম্পূর্ণ চর্বিজাতীয় খাদ্য। হাড় শক্ত করার কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত চর্বিজাতীয় খাদ্য হার্টের সুস্থতায় সমস্যা করতে পারে। এই ঝুঁকি না নিতে চাইলে দুধ ছাড়া অন্য ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। কমলালেবু, আমন্ড বাদাম, বিনস, ওট, ঘন সবুজ রঙের সব্জি বিনা আপোসের ক্যালসিয়ামের উৎস, যাতে দুগ্ধজাত ক্যালসিয়ামের গ্রহণের মতো ক্ষতিকারক উপায়ের সাথে হৃদরোগকারী সম্পৃক্ত চর্বিজাতীয় পদার্থ নেই।

উমা

মিক্সচার জমানা বনাম প্রযুক্তি নির্ভর চিকিৎসা

অরুণালোক ভট্টাচার্য

পুতুল নাচের ইতিকথা (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়)-য় যামিনী কবিরাজের সঙ্গে শশী ডাক্তারের দ্বন্দ্ব যতটা না সেনদিদিকে নিয়ে, তার চাইতে বেশি বোধহয় চিকিৎসার প্রজন্মগত প্রয়োগের ফারাক নিয়ে। শশী আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে শিক্ষিত তার মনে হয়। যামিনী কবিরাজের রোগনির্ণয় পদ্ধতিকে শশীর ভুল বলে মনে হলে সংঘাতের সূত্রপাত হয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানে প্রযুক্তি কিন্তু চুপিসাড়ে ঢুকে পড়েছে মিক্সচার জমানারও বহু আগে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেই বিজ্ঞানীরা মাইক্রোস্কোপের তলায় রক্তের লোহিত কণিকা দেখে ফেললেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে এসে রোন্টজেন সাহেব এক্স-রে নামক এক রশ্মির সাহায্যে তাঁর নিজের স্ত্রীর হাতের অঙ্গুরীয়সহ ছবি তোলেন। মানব অঙ্গের সেই প্রথম এক্স-রে ছবি দেখে শ্রীমতি রোন্টজেনের কোনওরকম রোমান্টিক ভাবের উদয় হয়েছিল বলে মনে হয় না। কারণ সেই ছবি দেখে তাঁর উক্তি ছিল—'I have seen my death'. শ্রীমতি রোন্টজেনের অনুধাবন করা সেই 'মৃত্যু প্রতিবিম্ব' যে উত্তরকালে কত মানুষকে নতুন জীবন দান করেছে তার বুঝি ইয়ত্তা নেই। সুতরাং এটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে মিক্সচার জমানার বহু আগেই প্রযুক্তি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ঘরে সেঁধিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে মানুষ এই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে, উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবার সন্ধান করে গেছে। নিঃসন্দেহে সফলও হয়েছে।

এই যে বললাম উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবা— এর কি কোনও প্রমাণ আছে? তা আছে বৈকি। আসুন একটু পরিসংখ্যান দেখি। স্বাস্থ্যবান স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার সূচক হিসাবে যে কটি পরিসংখ্যান দেখা হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— ১) Life expectancy at birth বা জন্মকালীন সময়ে সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল। ২) Infant mortality rate বা এক বছর বয়সের নীচের শিশুদের মৃত্যুহার। ৩) Neonatal mortality rate বা নবজাতকের মৃত্যুহার ৪) Maternal mortality ratio মাতৃমৃত্যুর অনুপাত। ধরে নেওয়া যাক যে, গত শতাব্দীর সত্তরের দশক পর্যন্ত মিক্সচার জমানা ছিল। আশির দশকের গোড়ার দিকে, আমি যখন ডাক্তারি পড়তে শুরু করলাম, তখন বাজার থেকে মিক্সচার-কালচার বিলুপ্তপ্রায়। সে তখন টিমটিম করে বেঁচে আছে আমাদের ফার্মাকোলজির প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষায়। নীচের সারণিটি দেখলে বোঝা যাবে ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমরা কতটা এগিয়েছি।

সূচক	১৯৭০	২০২০
জন্মকালীন সময়ে সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল	৪৮.২৪ বছর	৭০.১৫ বছর
এক বছর বয়সের নীচের শিশুদের মৃত্যুহার	১৪৩ প্রতি ১০০০ নবজাতকে	২৭ প্রতি ১০০০ নবজাতকে
নবজাতকের মৃত্যুহার	৮৪ প্রতি ১০০০ নবজাতকে	২০ প্রতি ১০০০ নবজাতকে
মাতৃমৃত্যুর অনুপাত	প্রতি লক্ষ জীবিত নবজাতকে ৪০০	প্রতি লক্ষ জীবিত আনুমানিক নবজাতকে ৯৭

আচ্ছা না হয় বোঝা গেল যে ভারতবর্ষ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়েছে। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্যবিজ্ঞান এবং চিকিৎসাব্যবস্থা কিন্তু অঙ্গাঙ্গীভাবেই জড়িত। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই উন্নতিতে প্রযুক্তির ভূমিকা কতটুকু?

আসলে চিকিৎসার ধারণাটা আমাদের কাছে বেশিরভাগটাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমার রোগ, আমার চিকিৎসা, আমার ডাক্তার ইত্যাদি। একটু ভূয়োদর্শী হলে বোঝা যাবে যে, কমিউনিটি বা গোষ্ঠীর ভালো-মন্দ থাকাটাই কিন্তু সামগ্রিক চিকিৎসা ব্যবস্থার ভালো-মন্দের নির্ণায়ক। এই কমিউনিটি বা গোষ্ঠীর স্বাস্থ্যপরিষেবার দায়িত্বে থাকবেন স্বাস্থ্যকর্মী এবং ডাক্তারবাবুরা। সেখানে সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল বা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ভূমিকা নগণ্য। মিক্সচারের জমানাতেও তাই-ই ছিল। কিন্তু মানুষপ্রতি ডাক্তার-নার্সদের আনুপাতিক হার ছিল অত্যন্ত কম। চোখ টেনে, পেট টিপে এবং নাড়ি ধরে রোগ নির্ণয় করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ওষুধের রকম এবং সংখ্যাও ছিল খুব কম। ফলত মানুষ সেই ব্যবস্থাটিকে মেনে নিতে খানিকটা বাধ্যই হয়েছিল। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে মানুষ যে খুব একটা ভালো ছিল না, তা তো পরিসংখ্যানেই প্রমাণিত। প্রযুক্তির সুষ্ঠু প্রয়োগের তো প্রশ্নই নেই। তারপরে সময়ের সাথে সাথে, ভারতবর্ষের ডাক্তার-নার্সদের সংখ্যা বেড়েছে। সেই বর্ধনের হার নিঃসন্দেহে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের তুলনায় বেশি। তাই আজ আমরা WHO নির্ধারিত

ডাক্তার-মানুষ অনুপাতের (প্রতি হাজার মানুষ পিছু একজন ডাক্তারবাবু) কাছাকাছি পৌঁছে গেছি (প্রতি দেড় হাজার মানুষ পিছু একজন ডাক্তারবাবু)। *

মানুষের আয়ুষ্কাল বেড়ে যাওয়ার পেছনে বয়সকালের অসংক্রামক রোগ যেমন —উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের রোগ নির্ণয় এবং তার চিকিৎসা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। শিশুদের টীকাকরণের মাধ্যমে শিশুকালের মারণ সংক্রমণ যেমন টিটেনাস, ডিপথেরিয়া, হাম, হুপিং কাশি ইত্যাদির থেকে বহুলাংশে পরিত্রাণ মিলেছে। নারীদের পুষ্টি, রক্তাল্পতা ও টিটেনাসের টীকা প্রদান নিয়ে বিভিন্নরকম প্রকল্প মাতৃ মৃত্যুর হার কমাতে সাহায্য করেছে। এত যে প্রকল্প এবং তার প্রয়োগ, সেগুলোতে কিন্তু প্রযুক্তির ব্যবহার প্রায় অপরিহার্য। ব্লাড প্রেসার মাপার পারদরহিত যন্ত্র এখন মণিবন্ধের কব্জিঘড়িতে। ব্লাড সুগার মাপার সুযোগ এখন আঙুলের ডগায়। ক্যান্সার রোগ নির্ণয়ের হরেকরকম প্রযুক্তি ক্যান্সার রুগীদের বাঁচার আশা জোগাচ্ছে। ভারতে নির্মিত ভ্যাকসিন বা প্রতিষেধক টীকা, কারখানায় উৎপাদিত হয়ে, কোল্ড চেন বা শীতল শৃঙ্খল বেয়ে, হাজার হাজার কিলোমিটার দূরের প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে যাচ্ছে উপভোক্তার কাছে। প্রযুক্তির কি অসাধারণ প্রয়োগ ! কোভিডকালেও দেখেছি, টীকাকরণের অবকাঠামোকে কাজে লাগিয়ে ভারতবর্ষের ১৪০ কোটি মানুষের টীকাকরণের অসাধ্য সাধন প্রয়াস। বিশ্বে অভূতপূর্ব। প্রযুক্তির আরেক চমকপ্রদ প্রয়োগ হল পরিসংখ্যান সংরক্ষণ। তথ্যসংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং পরবর্তীতে তার উপযুক্ত প্রয়োগ চিকিৎসাবিজ্ঞানের নীতি নির্ধারণে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনেছে। আজকের যাবতীয় আলোচনার ভিত্তিই তো কিছু পরিসংখ্যান—যা আজ সর্বজনীন ও সহজলভ্য।

প্রযুক্তির রথ তো টগবগিয়ে ছুটছে। রথের রাশ ধরা আছে মানুষের হাতেই। সামনে চোখ ধাঁধানো সব রাস্তার মোড়। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের দিগন্ত উন্মোচনকারী এক একটি প্রযুক্তি। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ভার্চুয়াল এবং অগমেন্টেড রিয়্যালিটি, ন্যানোটেকনোলজি, জিনোম সিকোয়েন্সিং, রোবোটিক্স এবং আরও কত কি। বিখ্যাত স্টার ট্রেক সিরিজের ডাঃ ম্যাককয়ের ট্রাইকর্ডার মেশিন আজ আর কল্পনা নয়। হাতের তালুর আয়তনের মেশিনের সাহায্যে আজ হার্ট-রেট, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, রক্তচাপ, শরীরের তাপমাত্রা আর শরীরের অন্যান্য আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজলভ্য। কিন্তু স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রযুক্তির প্রয়োগ নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা নয়। শুরুতেই বলেছি রাশ ধরে থাকার কথা। সেই রাশটি আলগা হয়ে গেলে কিন্তু সমূহ বিপদ। আসলে প্রযুক্তির সঙ্গে থাকা এবং সম্পূর্ণভাবে প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে পড়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক। মডার্ন টাইমস সিনেমায়, সেই খাদ্যযন্ত্রের কথাটি মনে করুন। যন্ত্রটি কিঞ্চিৎ বিগড়ে যাওয়াতে বেচারি চার্লি চ্যাপলিনের কি দুর্গতিটাই না হয়েছিল। প্রযুক্তি বিভ্রাটের আরও কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। গত মাসের এইমস হাসপাতালে সাইবার আক্রমণের ঘটনা সকলের অজানা নয়। পরিসংখ্যান ব্যবস্থা আজকের যুগে স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। স্বাস্থ্যের বর্তমান হাল হকিকৎ থেকে ভবিষ্যতের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণে এই পরিসংখ্যান ও তথ্যভাণ্ডারের গুরুত্ব অসীম। এই পরিসংখ্যানের গোপনীয়তা কোনওভাবে লঙ্ঘিত হলে দেশব্যাপী তার প্রভাব পড়তেই পারে। স্বাস্থ্যকর্মীদের দ্বিতীয় আরেকটি সমস্যা হল, এই প্রযুক্তি, তার যন্ত্রপাতি এবং রুগী—তিনটি জিনিসকে একসঙ্গে সামলানো। রুগীর ভিড়ে ঠাসা আউটডোরে যদি স্টেথোস্কোপটি বেগড়বাই করে, তখন স্টেথোস্কোপ সারাবো না রুগী দেখব। সে এক অদ্ভুত বিড়ম্বনা! আসলে দৈনিক কাজের সময়ের যেটুক রুগীর পিছনে ব্যয় করা উচিৎ, তার কিছুটা যদি প্রযুক্তির দেখভালের পিছনেই চলে যায় তাহলে অধর্ম হয়। সবশেষে যে কথাটা আমার এবং অন্যান্যদেরও হয়তো কিছুটা মনে হয় যে, প্রযুক্তি কিছুটা হলেও মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব বাড়িয়েই চলেছে। মিক্সচারের যুগে পাড়ায় যে ডাক্তারবাবু থাকতেন তিনি মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সব কিছুরই চিকিৎসা করতেন--- গাদাখানেক পরীক্ষানিরীক্ষা ছাড়াই। তাঁকে সহজেই পাওয়া যেত এবং তাঁর কাছে চিকিৎসা খুব খরচসাপেক্ষ ছিল না। আস্তে আস্তে প্রযুক্তির হাত ধরে আমরা বুঝলাম মাথার ব্যারামের জন্য ইইজি বা এম আর আই স্ক্যান বা অন্যান্য কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা করলে রোগটির নির্ণয় সম্ভব। তার জন্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও আছেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই মানুষ এই চিকিৎসায় আকৃষ্ট হতে শুরু করল। খরচও বাড়লো। চিকিৎসা পণ্যে পরিণত হল। খুব স্বাভাবিকভাবে ভোক্তা তার খরচের হিসেব কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে চাইছে। স্বাস্থ্যপণ্য প্রদানকারী কর্মীরা তাদের ভুলত্রুটি ন্যূনতম করার জন্য করাচ্ছেন আরও পরীক্ষানিরীক্ষা। অদ্ভুত এবং অবশ্যম্ভাবী এই টানাপোড়েনে হারিয়ে যাচ্ছে সহমর্মিতা। প্রযুক্তির চড়া আলোয় দৃশ্যমান হচ্ছেন না অগ্নিশ্বর ডাক্তারবাবুরা।

আসলে দ্বন্দ্বটা পুরনোর সঙ্গে নতুনের। নতুন পরিবর্তনে প্রযুক্তি এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গবিশেষ। একে অস্বীকার করার

উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কিন্তু যখন জানি উন্নতিপথে যাত্রার আর শেষ নেই, কোথাও নৌকা বেঁধে নিদ্রা দেবার স্থান নেই, ঊর্ধ্বে কেবল ধ্রুবতারা দীপ্তি পাচ্ছে এবং সম্মুখে কেবল তটহীন সমুদ্র, বায়ু অনেক সময়েই প্রতিকূল এবং তরঙ্গ সর্বদাই প্রবল, তখন কি বসে বসে কেবল ফুলস্ক্যাপ কাগজের নৌকা নির্মাণ করতে প্রবৃত্তি হয়।' প্রযুক্তিকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে সঠিকভাবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ব্যবহার করলে মানবজাতির উন্নতি বৈ ক্ষতি হবে না।

* এখানে আয়ুষ ডাক্তারবাবুদের বাদ দিয়ে হিসাব করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র ঃ

১) The World Bank data

২) TECHNOLOGY IN HEALTH CARE BLESSING OR CURSE? Gyorgy G Jeiros, Anthony E Bunn

৩) The Disadvantanges of Technology in Healthcare - GALEN DATA

৪) নূতন ও পুরাতন — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উ মা

রাজস্থানে উটের বংশ লোপ পেতে চলেছে

নিরঞ্জন হালদার

রাজস্থান ছিল মরুভূমির দেশ এবং সেই সঙ্গে উটের দেশ। মরুভূমির উষ্ণ আবহাওয়ায় এবং জলের অভাবে একমাত্র উটই বেঁচে থাকতে এবং চলাফেরা করতে পারে। মরুভূমিতে যে ঘাস জন্মায়, সেই ঘাস উটের খাদ্য। ঐ ঘাস খেলে উট ও গরু ঘন দুধ দেয়। মরুভূমিতে উটের দুধ গরুর দুধের অভাব মেটায়। আগে মরুভূমির মধ্য দিয়ে উট চলাফেরা করত এবং উটের পিঠে করে মরুভূমিতে পণ্য পরিবহন করা হত। সেজন্য এক সময়ে উটকে বলা হত মরুভূমির জাহাজ।

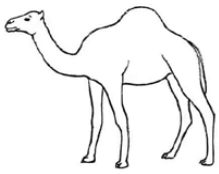

রাজস্থানে মরুভূমির মধ্য দিয়ে নতুন নতুন রাস্তা হওয়ায় এবং সেই রাস্তা দিয়ে গাড়ি, বাস এবং মালবাহী ট্রাক যাতায়াত করায় পণ্য পরিবহনের জন্য উটের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে এবং উট পালকদের উট পিছু আয়ও কমেছে। হিমাচল প্রদেশের পোঙ ড্যামের জল রাজস্থান ক্যানেল দিয়ে রাজস্থানে আসায় মরুভূমির এলাকাও কমিয়ে দিয়েছে। সেজন্য রাজস্থানে ক্যানেল এলাকায় পণ্যবাহী জন্তু হিসাবে উটকে আর দেখা যাচ্ছে না। একই সঙ্গে উটের খাদ্য অমিল এবং দুর্মূল্য হওয়ায় উট-পালকদের সমস্যা বৃদ্ধি পায়। পুষ্কর মেলা এবং অন্য এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা উট কিনে ভিন রাজ্যে নিয়ে বিক্রি করতেন বা নিজেরা জবাই করে উটের মাংস বিক্রি করতেন। রাজস্থানে বন শেষ হওয়ায় এবং বারবার খরার জন্য উটের খাদ্যের অভাবে উট পোষা ব্যয়সাধ্য হয় এবং ভিন্ন রাজ্যে উটের পাচার বেড়ে যায়। তাই রাজস্থানে উটের প্রজাতি বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজে ২০১৫ সালে রাজস্থান বিধানসভায় পাশ করান — 'দ্য রাজস্থান ক্যামেল (প্রহিবিশান অব স্লটার এবং রেগুলেশান অব টেম্পোরারি মাইগ্রেশন অর এক্সপোর্ট) অ্যাক্ট'। গো-হত্যা নিষিদ্ধ করার মতো এই আইনে উটের হত্যা এবং রাজস্থান রাজ্যের বাইরে উট নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়। বিক্রির উদ্দেশ্যে রাজস্থানের এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় উট নিয়ে যাওয়াও নিষিদ্ধ হয়। বিক্রি অথবা মাংস হিসাবে বিক্রির উদ্দেশ্যে ভিনরাজ্যে উট নিয়ে যাওয়াও বন্ধ হয়। জেলাশাসক বা সরকার নিযুক্ত আধিকারিকরা অনুমতি নিয়ে কৃষি বা দুধের ব্যবসার জন্য অথবা পশুমেলায় প্রদর্শনীর জন্য উট নিয়ে যাওয়া যাবে। এই অনুমতিপত্র দেওয়ার সময়ে দেখতে হবে এলাকায় যাতে উটের সংখ্যা কমে না যায়।

উট সংরক্ষণের এই আইন উট পালনে বা উট বিক্রিতে সঙ্কট সৃষ্টি করেছে, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে, উট পালক রাইকা এবং রাইকারি গোষ্ঠীর লোকেরা জানিয়েছে, উট অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য সরকারি অনুমতি পেতে মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। রাজস্থান সরকারের পশু দপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, ২০১১ সালে পুষ্কর মেলায় উট কেনাবেচা হয়েছিল ৮,২৩৮টি এবং ২০১৯ সালে এই সংখ্যা নেমে আসে ৩,২৯৪-তে।

সরকারের অনুমতি দেওয়ার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উট পালকেরা ক্রমাগত বিক্ষোভ জানিয়ে থাকেন। এই আইনের ফলে উটের সংখ্যাবৃদ্ধির বদলে উটের সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। যেমন, রাজস্থানের পশু সেন্সাস অনুসারে ২০১২ সালে রাজস্থানে ছিল ৩ লক্ষ ২০ হাজার উট, ২০১৯ সালে ঐ সংখ্যা কমে হয়েছে ২ লক্ষ ১২ হাজার উট। যাঁরা আগে উট পুষতেন, তাঁদের অনেকে উট পোষা ছেড়ে দিয়েছেন। রাজস্থানের কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী জানিয়েছেন, গত ৩০ বছর যাবৎ উটের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৫ সালের আইন সংশোধন না করলে উটের সংখ্যা কমতেই থাকবে। (পরিসংখ্যান ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস)।

উ মা

বিকল্প চিকিৎসার পুনরুত্থান ও হোমিওপ্যাথি গবেষণার নতুন অভিমুখ

সুব্রত রায়

দ্বিতীয় পর্ব

বিংশ শতকের মাঝামাঝি দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে হোলিজমের আবির্ভাবের সাথে সাথে মরমীয়াবাদ (mysticism) নানান চেহারায় বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'বিকল্প' পদ্ধতিগুলি হয়ে ওঠে এর বাহন। জীবনীশক্তিবাদের (vitalism) আকারে বিকল্প চিকিৎসায় মরমীয়াবাদ এমনিতেই উপস্থিত ছিল, 'বায়োমেডিসিন'-এর ন্যায্য ও অন্যায্য নানা উত্তরাধুনিক সমালোচনার হাত ধরে তা আবারও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল। হোমিওপ্যাথিতে অনুকৃতিমূলক জাদু (imitative magic) নির্ভর করে লজিক দিয়ে সদৃশ নিয়মকে ব্যাখ্যা করা ও জীবনীশক্তির ধারণার সাহায্যে লঘুকরণের নিয়মের যৌক্তিকতা খুঁজে ফেরা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না, 'প্রকৃতি'কে ব্যবহার করে 'সমগ্র মানুষ'-এর শারীরিক, মানসিক ও 'আধ্যাত্মিক' সুস্থতা ফিরিয়ে দেবার নতুন দাবি নিয়ে তা হোলিজিমের হাত ধরতে দ্বিধা করল না।

কিন্তু পূর্ববর্তী শতকের অভিজ্ঞতায় এটি বোঝা গিয়েছিল যে, আধুনিক বিজ্ঞানের মানদণ্ডে হোমিওপ্যাথির তত্ত্বগুলিকে উত্তীর্ণ না করতে পারলে কেবল মরমীয়বাদের ভরসায় দীর্ঘমেয়াদীভাবে টিকে থাকা কঠিন। ইতিমধ্যে চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেক বদলে গেছে। একটি রাসায়নিককে 'ওষুধ' হিসাবে স্বীকৃত হতে গেলে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষার অনেকগুলি ধাপে একে উত্তীর্ণ হতে হচ্ছে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি স্কটিশ সার্জন জেমস্ লিন্ড স্কার্ভি রোগ সারানোর উপায় খুঁজতে গিয়ে যে নিয়ন্ত্রিত ক্লিনিক্যাল পরীক্ষার সাহায্য নিয়েছিলেন, তা ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষার আবশ্যিক পদ্ধতিগত উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। যে কোনও ওষুধ বা চিকিৎসার সঙ্গে যুক্ত অনির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক (psychological) ও মনোশারীরবৃত্তীয় (psycho-physiological) ক্রিয়ার প্রভাবকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাসায়নিক বা চিকিৎসা পদ্ধতিটির রোগ সারানোর নির্দিষ্ট ক্ষমতা যাচাই করার রাস্তা দেখিয়েছে লিন্ড-এর পরীক্ষা। ওষুধের বিষক্রিয়া ও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার দিকটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ না করে মানবদেহে সরাসরি ওষুধ প্রয়োগের নৈতিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠে পড়েছে, ওষুধ হিসাবে প্রস্তাবিত যে কোনও নতুন রাসায়নিক আগে জীবজন্তুর দেহে প্রয়োগ করে নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করা হচ্ছে। এতসব সতর্কতা গ্রহণের পরেও ১৯৬০-এর দশকে ঘটে যাওয়া থ্যালিডোমাইড বিপর্যয় এই গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছে যে, সমাজে প্রয়োগের আগে কোনও ওষুধের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলে কিছু হয় না। ঊনবিংশ শতকেই হোমিওপ্যাথির তথাকথিত সাফল্যের অন্তরালে 'প্রকৃতি'-র অদৃশ্য হাতের কথা উঠে এসেছিল (Nicholls 1988: 115-16)। কাজেই, নতুন করে ফিরে আসা হোমিওপ্যাথির রোজকার গবেষণা কার্যক্রমে আধুনিক ক্লিনিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষার মানদণ্ড প্রয়োগ না করে উপায় নেই। অন্যদিকে, হোমিওপ্যাথির মৌলিক নিয়ম দুটিও আধুনিক প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। ফলে বিজ্ঞান হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে এই দ্বন্দ্বেরও নিষ্পত্তি ঘটা দরকার। অর্থাৎ ১৯৭০-এর দশকে পুনরুত্থিত হোমিওপ্যাথির গবেষণায় মেটিরিয়া মেডিকার সমৃদ্ধির বিষয়টি কতকটা অপ্রধান হয়ে উঠল, মুখ্য হয়ে উঠল দুটি বিষয়: ১) ক্লিনিক্যাল পরীক্ষানিরীক্ষার সাহায্যে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা প্রমাণ করা, এবং ২) আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাসঙ্গিক তত্ত্বগুলির সাথে সাযুজ্যহীনতার নিরসন ঘটিয়ে হোমিওপ্যাথির (mechanism of action) ক্রিয়াবিধির যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা হাজির করা।

প্রথমটি না হলে দ্বিতীয়টির প্রশ্নই উঠতে পারে না, বলাই বাহুল্য। রোগ সারানোর ব্যাপারে হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতাই যদি আদৌ প্রমাণিত না হয়, তবে কী-ই বা ব্যাখ্যা করব, কাকেই বা ব্যাখ্যা করব! কিন্তু হোমিওপ্যাথির চর্চায় এই আশ্চর্য ঘটনাটিই বারবার ঘটে যে, এর সমর্থকেরা প্রায়শই এর কার্যকারিতার নিশ্চিত প্রমাণ পাবার আগেই সে কার্যকারিতা আছে ধরে নিয়ে 'আধুনিক বিজ্ঞানের' সাহায্যে তার নানা সম্ভব-অসম্ভব ব্যাখ্যা হাজির করতে থাকেন। তাঁরা এই গোড়ার কথাটা ভুলে যান যে, বিজ্ঞান শুধু বাস্তব জগতের বস্তু বা ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে দায়বদ্ধ, যার অস্তিত্ব নেই তার ব্যাখ্যা জোগাবার কোনও দায় বিজ্ঞানের থাকে না মোটেই। বিজ্ঞান অতি অবশ্যই সত্যের প্রতি দায়বদ্ধ, এবং আপাত-অসম্ভব কোনও তথ্যকে স্থান দিতে গিয়ে বিজ্ঞানের তত্ত্বকাঠামোতে বিপ্লবও ঘটে যেতে পারে। কিন্তু যাকে 'তথ্য'

বলে দাবি করা হচ্ছে তা সত্যিই 'তথ্য' বলে গ্রাহ্য হতে পারে কিনা, সেটা ভাল করে বুঝে না নিয়ে বিজ্ঞান এক পা-ও এগোতে পারে না। ফলে, কোনও আনকোরা নতুন পর্যবেক্ষণের দাবি যখন ওঠে, তখন আগেই তার ব্যাখ্যার জন্য ব্যস্ত না হয়ে বিজ্ঞানের প্রাথমিক দায় হচ্ছে দাবিটির সত্যতা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে সে ব্যাপারে একশো ভাগ নিশ্চিত হয়ে নেওয়া। এটাও সেইহেতু অতিশয় সহজবোধ্য যে, দাবিটি যতই অস্বাভাবিক বা চমকপ্রদ হবে, তার সত্যতা সংক্রান্ত পরীক্ষাগুলিকেও ততই কঠোর ও সতর্ক হতে হবে। এই সত্য-মিথ্যা প্রমাণের প্রাথমিক ছাঁকনিটি পেরোতে পারলে তবেই গালে হাত দিয়ে গম্ভীরভাবে তার 'বৈজ্ঞানিক' ব্যাখ্যা খুঁজতে বসার প্রশ্ন আসবে। কাজেই, এখন প্রথমে আমরা দেখে নেব, হোমিওপ্যাথি আদৌ রোগ সারাতে পারে কিনা সে প্রশ্নে হোমিও-গবেষণার পরিস্থিতিটা ঠিক কেমন। আর তারপর আমরা যাব দ্বিতীয় প্রশ্নে, অর্থাৎ, হোমিওপ্যাথি-তাত্ত্বিকরা এ চিকিৎসার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হাজির করার দায়টি ঠিক কীভাবে সামলানোর চেষ্টা করছেন।

চিকিৎসার কার্যকারিতা বিচার ঃ কাজের ও অকাজের তথ্য

কোনও চিকিৎসাপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে অনেকেই ভাবেন যে, ওষুধ কীভাবে রোগ সারায় তা জেনে কাজ নেই, রোগ সারাটাই যথেষ্ট। আজকে যা 'অজ্ঞাত', কাল তা প্রমাণ হতেই পারে। সুতরাং, রোগ সারছে কিনা সেটাই হল আসল ব্যাপার! কিন্তু ওই যে বললাম—'রোগ সারছে কিনা'—এই বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও যে জলের মতো সোজা নয়, তা খুব কম মানুষই বোঝেন।

অধিকাংশ হোমিওপ্যাথই (এবং হোমিও-অনুগত রোগীরাও) মনে করেন যে, হাজার হাজার হোমিওপ্যাথের রোজকার চিকিৎসার অভিজ্ঞতাই হোমিওপ্যাথির কার্যকারিতা বিচার করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু মুশকিল হল, চিকিৎসায় অভিজ্ঞতার মূল্য থাকলেও তা কোনওভাবেই প্রমাণের বিকল্প নয়। এর কারণ হল, চিকিৎসকের অজ্ঞাতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় নানান পক্ষপাত (bias) মিশে থাকে : ১) চিকিৎসক স্বভাবত তাঁর চিকিৎসার সফল ঘটনাগুলিকে মনে রাখেন, ব্যর্থতা ভুলে যান; ২) রোগীর ফিরে না আসাটা তাঁর কাছে প্রায়শই সফলতার নিদর্শন বলে বোধ হয়, কিন্তু ব্যর্থ চিকিৎসার ক্ষেত্রেও এমনটি হতে পারে; ৩) চিকিৎসকের অজ্ঞাতে রোগী অন্য চিকিৎসকের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন; ৪) রোগ ভালো হলেই চিকিৎসক সাফল্যের দাবিদার হয়ে ওঠেন, কিন্তু রোগ সারার সঙ্গে চিকিৎসার আদৌ কোনও সম্পর্ক না থাকতে পারে।

এর পাশাপাশি তাঁরা কখনও কখনও হোমিওপ্যাথির দুশো বছরের দীর্ঘ ইতিহাস ও জনপ্রিয়তার কথা স্মরণ করান। কোনও কিছু বিষয় সমাজে নানা কারণে দীর্ঘকাল টিকে যেতে পারে একে কার্যকারিতার প্রমাণ হিসাবে দাখিল করা যায় না। ঝাড়ফুঁক-তুকতাক প্রস্তর যুগ থেকে চলে আসছে মানে এই নয় যে, এসবে কাজ হয়। হ্যানিম্যানও ঐতিহ্য ও প্রাচীনতার খাতিরে দু-হাজার বছরের পুরোনো গ্রিক রসতত্ত্বকে রেয়াত করেন নি। হোমিওপ্যাথির জনপ্রিয়তারও নানান কারণ আছে, বর্তমান রচনায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। তবে আমাদের দেশের ক্ষেত্রে একটি কথা বলাই যায় যে, নানা রকম চিকিৎসা গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের যে বহুত্ববাদের কথা শোনা যায়, তা কিন্তু আদৌ চিকিৎসা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা বা বহুল বিজ্ঞাপিত 'ভারতীয় উদারতা'র সমার্থক নয়, আধুনিক চিকিৎসার অপ্রতুলতাই এজন্য দায়ী। (Sheeham 2009)।

আসলে 'স্বাস্থ্য' এক বহুমাত্রিক জটিল ব্যবস্থা, সুস্থতাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন বিষয়গুলির প্রতিটির প্রভাব রোজকার জানা কোনও পদ্ধতির সাহায্যে আলাদা করে হিসেব করে বার করতে পারলে চিকিৎসার ভালোমন্দ নির্ণয়ের কাজটা সহজ হত। রোগ সারার পেছনে চিকিৎসার নির্দিষ্ট ফার্মাকোলজিক্যাল হস্তক্ষেপ ছাড়াও অনেক কিছুরই ভূমিকা থাকে। দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রথমেই আসবে রোগটির নির্দিষ্ট প্রকৃতির কথা, যা রোগভোগের সময়, মাত্রা ও গতিপ্রকৃতি স্থির করে দেয়। এমন হতে পারে যে, রোগটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত (self-limiting) অর্থাৎ দেখা দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় পরে রোগীর শরীরের অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ায় আপনিই সেরে যায়। কিংবা এমনও হতে পারে যে, রোগটির লক্ষণের প্রকাশ পর্যায়ক্রমিক (periodic) অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর বাড়ে ও কমে। সেক্ষেত্রে রোগীরা সাধারণত রোগযন্ত্রণা চরমে পৌঁছালে চিকিৎসকের সাহায্য প্রার্থনা করে, ফলে চিকিৎসকের সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাতের সময়ে স্বাভাবিকভাবে রোগভোগ অনেকটাই কমে আসে (regression towards the mean)। এবং রোগী ভুলভাবে চিকিৎসার কার্যকারিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন (যুক্তিশাস্ত্রের ভাষায় যাকে বলে 'post hoc fallacy')। আবার, কোনও ওষুধের রোগ সারানোর নির্দিষ্ট ক্ষমতার (therapeutic effect) বাইরে অনির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক (psychological) ও মনোশারীরবৃত্তীয় (psycho-physiological) ক্রিয়ার বিশেষ

ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে। যে কোনও ওষুধ বা চিকিৎসার সাথেই এই বাড়তি বিষয়গুলি যুক্ত থাকে। এই অনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রকগুলির প্রভাবকে সম্মিলিতভাবে প্লাসিবো ক্রিয়া (placebo effect) বলা হয়। লাতিন ভাষায় 'প্লাসিবো' শব্দের অর্থ হল— 'আমি খুশি করব', অর্থাৎ চিকিৎসার ক্ষেত্রে 'প্ল্যাসিবো' বলতে নিষ্ক্রিয় কোনও পদার্থ ব্যবহার করে স্রেফ রোগীর সন্তুষ্টিবিধানের মাধ্যমে চিকিৎসা করাকে বোঝায়। ওষুধের কার্যকারিতা নির্ণয়ের পরীক্ষায় বিষয়টি বর্তমানে এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে ক্লিনিক্যাল পরীক্ষায় প্লাসিবো সংক্রান্ত তথ্য না থাকলে সেই পরীক্ষাকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হয় না। সম্পূর্ণ অকেজো কোনও পদার্থ বা চিকিৎসা পদ্ধতি ব্যবহার করেও রোগ সারার পেছনে প্রধান কারিগর এই প্লাসিবো ক্রিয়া।

ওষুধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকা এই প্লাসিবো ক্রিয়ার ভূমিকাকে হিসেব থেকে বাদ না দিতে পারলে একটি পদার্থের সত্যিকারের রোগ সারানোর ক্ষমতা বোঝা সম্ভব নয়। 'জোড়া-অন্ধের পরীক্ষা'-তে (double-blind controlled trial) ঠিক এই কাজটিই করা হয়ে থাকে। বর্তমানে যে চেহারায় এই পরীক্ষাটি করা হয়, তার প্রথম প্রয়োগ ঘটে ১৯৬৮ সালে (Brody 1980:8)। এতে নির্দিষ্ট অসুখে আক্রান্ত বেশ কিছু রোগীকে সমান দুটি দলে ভাগ করা হয়। একদলের প্রত্যেককে প্রস্তাবিত রাসায়নিকটি দেওয়া হয়, অন্যদল পায় একই রকম স্বাদ-বর্ণ-গন্ধযুক্ত ওষুধগুণহীন পদার্থ বা নকল ওষুধ (plcebo)। কে কোনটি পেল, তা রোগী ও চিকিৎসকদের কাছে অজ্ঞাত থাকে—এই কারণে 'জোড়া-অন্ধ' কথাটি এসেছে। কেবলমাত্র কিছু নিরপেক্ষ ব্যক্তি, যাঁরা পরীক্ষাশেষে তথ্য বিশ্লেষণের কাজে যুক্ত হবেন, তাঁরা এটি জানবেন। নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী রোগীদের শারীরিক অবস্থার তথ্যগুলি নথিভুক্ত করা হয়। পরীক্ষাশেষে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে দ্বিতীয় দলটির তুলনায় প্রথম দলের শারীরিক অবস্থার তুল্যমূল্য বিচার চলে, যা থেকে রাসায়নিকটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে (randomised controlled trial, *RCT*)। কখনও কখনও নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এই পরীক্ষাটির আরও জটিল রূপ ব্যবহার করা হয়। যেমন, প্রথমবারের পরীক্ষায় যে দলকে ওষুধ ও প্লাসিবোর মধ্যে যেটি দেওয়া হয়েছিল, দ্বিতীয়বারে তাদেরকে অন্যরকম দেওয়া হয়। আবার রোগবিশেষে কখনও কখনও প্লাসিবোর সাথে তুলনা না করে ইতিপূর্বে প্রতিষ্ঠিত কোনও ওষুধের সাথেও প্রস্তাবিত রাসায়নিকটির তুলনা করা হয়। **(চলবে)**

ঊষা

বিপন্ন একুশ শতক : দুর্ভিক্ষ?

শ্যামল ভদ্র

এ বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ইতালির উপকূলে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ৬০ জনেরও বেশি পরিযায়ী মানুষের মৃত্যু হয়েছে, নৌকো ডুবে। এই বুভুক্ষু-আশ্রয়হীন মানুষেরা আফগানিস্তান, পাকিস্তান, সোমালিয় এবং ইরান থেকে ইতালি যাবার চেষ্টা করেছিল। এরকম ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা আগেও বেশ কয়েকবার ঘটে গিয়েছে, তবুও মানুষ বাঁচার জন্যে এই পথই বেছে নিচ্ছে। ইউনাইটেড নেশনস-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী ২০১৪ থেকে নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার পরিযায়ী মানুষ শুধু দেশান্তরে যেতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। এখন পর্যন্ত ঊনিশটি দেশকে আংশিক দুর্ভিক্ষ কবলিত দেশ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, অতি সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আফগানিস্তান, ইথিওপিয়া, সোমালিয়া, দক্ষিণ সুদান এবং ইয়েমেন—এই পাঁচটি দেশে। এই সব দেশে খাদ্যের অভাব, কর্মসংস্থানের সুযোগ নেই, অপ্রতুল স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিশু ও মেয়েদের সুরক্ষা নেই, তাই মানুষ বাধ্য হয়ে দেশান্তরে যাবার চেষ্টা করছে। ইউনাইটেড নেশনস রিফিউজি এজেন্সি (UNHCR) রিপোর্টে ২০২২ সাল পর্যন্ত পৃথিবীব্যাপী রিফিউজিদের সংখ্যা প্রায় ১০ কোটিরও বেশি দেখানো হয়েছে, যা তাদের পৃথিবীব্যাপী নিরন্তর সমীক্ষার ফল। সেই সঙ্গে সারা পৃথিবী জুড়ে খাদ্যদ্রব্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি সাধারণ মানুষের জীবনকে অসহনীয় করে তুলেছে। রিফিউজি ক্যাম্পে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং মহিলাদের সুরক্ষার অভাব, ইত্যাদি কারণে স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট দেশগুলি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ফলত বাড়ছে জরুরি পরিষেবায় মজুরি বৃদ্ধির জন্যে ধর্মঘট এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মী সংকোচন। এই অনুষঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হল অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি। কিছুটা হলেও ভারতবর্ষ এর ব্যতিক্রম নয়।

ইউনাইটেড নেশনস গ্লোবাল পপুলেশন গ্রোথ অ্যান্ড সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট (GPGSD) তাদের ২০২১-এর রিপোর্টে উল্লেখ করেছিল যে, বিংশ শতাব্দীর মধ্য শতক থেকে একুশ শতকের শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা ২৫০ কোটি থেকে বেড়ে হবে ৭৯০ কোটি। অর্থাৎ বিগত ৭০ বছরে জনসংখ্যা বেড়ে হবে তিনগুণেরও বেশি। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ১৫ নভেম্বর ২০২২ পৃথিবীর

জনসংখ্যা পৌঁছেছে ৮০০ কোটিতে। উল্লেখ্য ২০২৩ সালেই ভারতবর্ষে জনসংখ্যা চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটিকে ছাড়িয়ে যাবে, পরিসংখ্যান অনুযায়ী সারা পৃথিবীর জনসংখ্যা ২০৩০ সালে দাঁড়াবে প্রায় ৮৭৯ কোটি, ২০৫০ সালে ৯৭০ কোটি এবং আরও বলা হয়েছে যে ২০৮০-তে জনসংখ্যা ১০৪০ কোটিতে পৌঁছবে যা পরবর্তী ২০ বছরে অর্থাৎ একুশ শতকের শেষ পর্যন্ত একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে। অনুমান করা যায় যে নতুন শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর জনসংখ্যা ধীর লয়ে হ্রাস পেতে থাকবে। সুতরাং বিগত ৭০ বছরে ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির যে বিস্ফোরণ শুরু হয়েছিল, তা আজ থেকে ৭০ বছর পরে জনসংখ্যার সেই বর্ধিত হারের গতি বিপরীতমুখী হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নিশ্চিত। বর্তমানে পৃথিবীতে যুদ্ধ, আফ্রিকা মহাদেশের কয়েকটি দেশে দুর্ভিক্ষ এবং পৃথিবী জুড়ে ব্যাপকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস স্বভাবতই আগামী ৭০ বছরের জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বিন্যাসকে সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করার সময় এসেছে, কারণ এই সাত দশকের পৃথিবীর ইতিহাস একটি সঙ্কটময় অধ্যায়ে উপনীত হতে চলেছে। যার ফল ভোগ করতে হবে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে যদি না আমরা এখুনি এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন হই। পৃথিবীর বুকে সঞ্চিত সম্পদ আর কতদিন মানুষসহ সমস্ত জীবজন্তুকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে তা সহজেই অনুমেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে যদি অতি উন্নত দেশের মানুষের সমান সুযোগ-সুবিধা দিতে হয় তাহলে চারটি পৃথিবীর মতো গ্রহের প্রয়োজন হবে। তাহলে কি সমাজে মানুষের অসম অবস্থান চলতেই থাকবে!

রিফিউজি ক্যাম্পে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এবং মহিলাদের সুরক্ষার অভাব, ইত্যাদি কারণে স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট দেশগুলি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ফলত বাড়ছে জরুরি পরিষেবায় মজুরি বৃদ্ধির জন্যে ধর্মঘট এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মী সংকোচন। এই অনুষঙ্গে অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় হল অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি।

কিছুদিন আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক সতর্ক করেছে যে, আবহাওয়ার ও জলবায়ুর খামখেয়ালিপনার জন্যে ২০৫০ সাল নাগাদ খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৮ শতাংশ কমে যাবে, কিন্তু সেই সময়ে আমাদের দ্বিগুণ উৎপাদনের প্রয়োজন হবে পৃথিবীর ৯৭০ কোটি মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে। সমস্যা প্রকট হবে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে। তাহলে সমস্যার সমাধান হবে কি করে? আমাদের দেশ ভারতবর্ষের কথাই ধরা যাক। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কিছুদিনের মধ্যে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা চীনের জনসংখ্যা ১৪১ কোটি ছাড়িয়ে যাবে, ২০৩০ সালে ভারতবর্ষের জনসংখ্যা ১৫০ কোটি আর ২০৫০ সালে ১৬০ কোটিরও বেশি হবে বলে অনুমান করা যায়। জনসংখ্যার নিরিখে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সমস্ত দেশকে ছাড়িয়ে যাবে। তবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে থাকবে, অন্যদিকে সবথেকে কর্মক্ষম যুবকদের বয়স বেড়ে যাবে। শিশু ও ষাটোর্দ্ধ প্রবীণ নাগরিকদের মোট সংখ্যা ৩৫-৪০ শতাংশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। অন্য আরেকটি সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে এই শতকে উন্নত দেশগুলিতে কর্মক্ষম মানুষের সংখ্যা ভীষণভাবে কমে যাবে, যার নমুনা আমরা বর্তমান সময়েই দেখতে পাচ্ছি। সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্যে ভারতের মতো দেশ থেকে ব্যাপক সংখ্যক কর্মক্ষম মানুষের পরিযাণ ঘটবে। ফলত দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ব্যাহত হবে প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মীর অভাবে। অন্যদিকে চিন্তার জগতেও খামতি দেখা দিতে শুরু করেছে, কারণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা দেশের বাইরে যেতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করছে। যোগ্যতা অনুযায়ী কর্মসংস্থান ও পরিবেশের অভাব—তাই মধ্যমেধা-নিম্নমেধার মানুষজনই সর্বত্র জাঁকিয়ে বসছে, যা আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি।

ভীষণ এক সামাজিক সংকটের সম্মুখীন হব আমরা বিশেষ করে পরবর্তী প্রজন্ম। দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা ও এই ভয়ঙ্কর অবস্থার নাগপাশ থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন, যেখানে সুস্থ বয়স্ক মানুষদের (৬০-৭৫) কিছুটা হলেও শিক্ষা ও উৎপাদনমুখী কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। যতটুকুই তারা দিতে পারে। দেশের ভেতরে সমস্ত স্তরে আরও বেশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ভারতীয়দের বিদেশে চলে যাবার প্রবণতা কমে। ইন্ডিয়ান ফুড সিকিউরিটি অ্যাক্ট-২০১৩ লাগু হয়েছে সেপ্টেম্বর ২০১৩ থেকে, সেই অনুযায়ী ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রতিমাসে পাঁচ কেজি খাদ্যশস্য পাবে। দু-টাকা কেজি দরে চাল, তিন টাকা কেজি দরে গম এবং এক টাকা কেজি দরে ভুট্টা জাতীয় জিনিস পাবে। করোনা-ভাইরাস সংক্রমণের সময় থেকে এখন পর্যন্ত বিনামূল্যেই সবকিছু পাওয়া যাচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রক্রিয়া কতদিন চলবে! তাই ভবিষ্যতে সমস্ত ভারতবাসীর খাদ্য নিরাপত্তার জন্যে অতি শীঘ্রই প্রকল্প-পরিকল্পনা জরুরি।

উমা

চিঠিপত্র

উৎস মানুষ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২১-এ আর্য রহস্য নিয়ে কিছু প্রশ্ন

১) লেখক লিখেছেন 'তবে সভ্যতার উন্মেষ অর্থাৎ বিভিন্ন জন্তুকে পোষ মানিয়ে গৃহপালিত করা, কৃষির ব্যবহার, স্থায়ীভাবে গ্রামে বসবাস ইত্যাদি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দের আগে থেকে বেলুচিস্তানের পাহাড়তলিতে শুরু হয়েছিল ... বিস্তার।'

লেখক হয়ত ষষ্ঠ সহস্রাব্দের কথা বলতে চেয়েছেন। কারণ এ এস আই খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়/চতুর্থ সহস্রাব্দের কথা বলে। লেখক অবশ্য পরেই বলেছেন খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের কথা, যখন 'বাদামী রঙের, লম্বা মাথা, সোজা চুলের মানুষ' সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'এদের এবং পরে অন্যান্য আগ্রাসী বহিরাগতদের চাপে শান্তিপ্রিয় নিরীহ মুণ্ডা ভাষাভাষীরা জঙ্গলে ও পাহাড়ে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল ...।'

এই কথাটার অর্থাৎ 'বাদামী...' ইত্যাদি জনগোষ্ঠীর আগমনের তত্ত্ব প্রমাণিত নয়। বৈদিক সাহিত্য থেকে অনুমান করা হয় তারা অন্য শ্রেণীর মানুষ ছিল। আর অনুমান করা হয় তারাই সিন্ধুসভ্যতার ধ্বংসের কারণ। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য থেকে সেরকম কিছু পাওয়া যায় নি। এ সম্পর্কে 'ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাসিক' থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। কিন্তু লেখক এই মতের সঙ্গে সহমত নন বলে J.M Kenoyer-এর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হল—The skeletons did not belong to one single period and there is no archaeological evidence for destruction, burning or looting of the city that would normally accompany a massacre. - p. 44

সোজা চুলের মানুষরা প্রাচীন দ্রাবিড় ভাষায় কথা বলত। ...কালক্রমে আর্যরা উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম থেকে দ্রাবিড়দের মুছে ফেলেছিল ... দ্রাবিড়রা তাদের ভাষা জিইয়ে রাখতে পেরেছিল দক্ষিণে ...এটা পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল না!

২) 'আর্য সভ্যতা একটি সরল গ্রামীন সভ্যতা। তাই সিন্ধুসভ্যতার প্রচুর রত্ন নিদর্শন রয়েছে, আর্য সভ্যতার নেই।'

'রত্ন নিদর্শন' বলতে লেখক কি বোঝাতে চেয়েছেন তা বোঝা গেল না। তবে আর্যদের ঘোড়া ছিল, ঘোড়া রথ ছিল। রথের চাকা (spoke) যুক্ত ছিল। আর তারা সুদূর মধ্য এশিয়ার স্টেপভূমি থেকে এসেছিল। তাই তাদের আগমন পথে কিছু মৃৎপাত্র, রথের ভাঙা অংশ, ঘোড়ার হাড় ইত্যাদি পড়ে থাকার কথা ছিল। কিন্তু তাদের আগমন পথে কোনো প্রত্নচিহ্ন এখনও পাওয়া যায় নি।

৩) 'আর প্রত্নতত্ত্ব থেকে ... নিবেদিত।' প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় নি। আর বেদ, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ মূলত ধর্ম এবং দর্শন সংক্রান্ত নয়। বেদের পরে ব্রাহ্মণ আর তারপরে উপনিষদ। উপনিষদেই দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এবং সেগুলি অনেক পরের লেখা। ঋগ্বেদে দর্শন চিন্তার পরিচয় তো নেই-ই। বরং ইন্দ্রকে বা বিষ্ণুকে আবাহন করে তাদের কাছে গোধনাদি সম্পদ প্রার্থনা করা হচ্ছে। একটি সূক্তে সরমা ইন্দ্রের প্রতিনিধি হয়ে পনিদের গোধন আনতে গিয়েছিলেন ভয় দেখিয়ে। অন্য একটি সূক্তে কৃষ্ণ ইন্দ্রকে আক্রমণের জন্য এসেছিলেন এবং ইন্দ্র তাঁর সেনাদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। ঋগ্বেদে একাধিক সূক্ত সরস্বতী নদীর বর্ণনা আছে। সে নদী বিশাল। অথচ আর্যরা যখন আসছেন বলা হচ্ছে, তার আগেই সরস্বতী শুকিয়ে গেছে। তাহলে ঋগ্বেদে স্রোতস্বিনী সরস্বতীর কথা কেমন করে এল?

৪) আর্যদের আক্রমণে যদি সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস না হয়ে থাকে তাহলে এত বিস্তীর্ণ এক সভ্যতা ধ্বংস হল কি করে? প্রত্নতাত্ত্বিকেরা বলেন সিন্ধুসভ্যতার পরিণতকাল থেকেই সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমেছিল। এছাড়া সরস্বতী নদীর উৎসের দিকে ভূ-তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ফলে তার প্রবাহ শুকিয়ে আসে আর সিন্ধু এবং সবরমতীর মোহনায় ক্রমাগত বন্যা হতে থাকে। এই ত্রিবিধ কারণেই এই সভ্যতা ধ্বংস নয়—পরিত্যক্ত হয়। আর সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা অন্য স্থানে চলে যায়।

এখন প্রশ্ন হল কোথায় চলে যায়! হিমালয়ের দিকে তাদের যে বসতি ছিল, সেখান থেকে তারা গঙ্গা-যমুনা অববাহিকার দিকে চলে যায় আর যাদের বসতি ছিল গুজরাট এবং সন্নিহিত অঞ্চলে তারা চলে যায় নর্মদা অববাহিকার দিকে বা আরও দক্ষিণে। ২০১৭ সালেই তামিলনাড়ুর শিবগঙ্গা জেলার কিলাডি গ্রামে তাইগাই নদীর উপত্যকায় সিন্ধুসভ্যতার ধরনের একটি ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। ১৯৯০ সালে যখন ধোলাবিরায় খনন কার্য চলছে তখন একদল ইটালিয়ান প্রত্নতাত্ত্বিক উত্তরপ্রদেশের মধ্যগঙ্গা অববাহিকার ফারুকাবাদ জেলার কাম্পিল গ্রামের কাছে দ্রুপদকিলা নামক স্থানে খোঁড়াখুঁড়ি করে ধোলাবিরার মতই এক বসতির ধ্বংসাবশেষ পেয়েছেন।

এছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক S R Rao লোথালের বাড়িগুলোর মধ্যে অনেক জায়গাতেই বৈদিক যজ্ঞস্থানের আকারের কিছু অগভীর জায়গা পেয়েছিলেন যেখানে পোড়া কাঠ বা ছাইয়ের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু তাঁর মতে এগুলো উনুন ছিল না। কারণ, নীচ থেকে জ্বালানি দেওয়ার ব্যবস্থা সেখানে ছিল না।

প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ইঙ্গিত যদি মানতে হয় তাহলে 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ...মনে করেছিল'—এই কথাটার পরিবর্তে সিন্ধুসভ্যতার লোকেরাই বৈদিক সাহিত্য রচনা করেছিল বলে মনে করতে হয়।

৫) পুনার ডেকান কলেজের পুরাতত্ত্ববিদ ড. বসন্ত শাঠে নন। তাঁর নাম বসন্ত শিবরাম শিন্ডে (Vasant Shivaram Shinde)। ড. শিন্ডে তাঁর ২০১৯-এর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এটা

পরিষ্কার হয়ে গেছে, যে ডি এন এ হরপ্পার কবর থেকে পাওয়া গেছে তার সঙ্গে ইরানিয় কৃষকদের ডি এন এ-র কোনো মিল নেই; কিন্তু আধুনিক উত্তর ভারতীয়দের মিল আছে। এই সঙ্গে যোগ করি—Strangely however, as with Mesopotemia, almost no artifacts of clearly Iranian origin made their way to the Indus Region. Nearly all the evidences of Harappan relations with the west has been brought to light in the foreign territories (the Persian Gulf, Mesopotemia, Iran) and not in Indian territories, as another French Archaeologist Henry-Paul Frankfort put it. There is no consensus among experts to explain this one sideness. Michel Danio. p. 110

৬) '১৯৯০ সালে ...সর্বপ্রাচীন অধিবাসী'। অবশ্যই এক শ্রেণীর মানুষের চেষ্টা চলছে এইভাবে সমস্ত ইতিহাসটিই তাদের পছন্দের রঙে রাঙিয়ে দেওয়ার। কিন্তু তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে আপনিও কি অন্যপথে বিচ্যুত হয়ে পড়বেন? সঠিক পথের দিশারি হবেন না?

যেখান থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে—India : Historical Beginnings and the concept of the Aryan. By Romila Thapar, J N Kenoyer, M M Despande, S Ratnagar.

— মাধব চৌধুরী

কলকাতা- ৩৯

উ মা

পত্রিকা পর্যালোচনা

'চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব-এর মুখপত্র বিজ্ঞান দিশারী। ১৯৭৭-এ স্থাপিত এই সায়েন্স ক্লাব। তবে মুখপত্র কবে থেকে বেরোচ্ছে তার উল্লেখ নেই। তাদের বার্ষিক সংকলন ২০২০ ও ২০২৩। ঝকঝকে প্রচ্ছদ বেশ চোখে পড়ার মতো। ছোট-বড় সবার কথা ভেবেই লেখাগুলো নির্বাচন করা হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু-মেঘনাদ সাহা-অক্ষয়কুমার দত্ত, হাঁটুর ব্যথা, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, শক্তি ও জলসম্পদ, আগুন আবিষ্কার এমনই সব বিষয় নিয়ে মনোগ্রাহী আলোচনা রয়েছে এই পত্রিকায়। বার্ষিক সংকলন ২০২০-র সম্পাদকীয়তে সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে বোঝা যায়—'বিজ্ঞানমনস্ক না হলে আমাদের তো কেবল আবেগতাড়িত হয়ে, আন্দাজের বশবর্তী হয়েই সিদ্ধান্ত নিতে হবে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। আর তাতে আমাদের বিপদের সম্ভাবনাই বাড়বে।' পত্রিকা সম্পাদক লিখছেন 'আমরা এমন এক সময়ে এসে পৌঁছেছি যখন অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত চিন্তা-ভাবনার প্রভাব বেশি চোখে পড়ছে। তাই এখন আরও বেশি করে বিজ্ঞান তথা প্রকৃতির মূল নিয়ম-নীতিগুলো সহজ করে লেখা, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের জন্য লেখা প্রকাশ ও পড়া জরুরি।' ঠিকই বলেছেন সম্পাদকমশাই। নইলে করোনা তাড়াতে বিজ্ঞানকর্মীদের দিয়া জ্বালাতে ও কাঁসর ঘণ্টা বাজতে দেখা যাবে। আর তা দেখে কিছুটা অনুপ্রাণিত হওয়া সাধারণ মানুষ-এর অপবিজ্ঞান ও অবিজ্ঞান চর্চা থেকে যেটুকু দূরত্ব তৈরি হয়েছিল তা কমে শূন্য হয়ে যাবে।

যোগাযোগ --- চিনসুরা সায়েন্স ক্লাব। ফোন ---৯৪৩৩৪৪০৬৬৬। ইমেইল—chinurahscienceclub@gmail.com

উ মা

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮ ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল

১। প্রকাশস্থান : বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪

২। প্রকাশকাল: ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রক: বরুণ ভট্টাচার্য

৪। মুদ্রণস্থান: জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন। কলকাতা-৭০০ ০০৬।

৫। সম্পাদক: সমীরকুমার ঘোষ, ৫২/৫১, শশিভূষণ নিয়োগী গার্ডেন লেন, কলকাতা- ৭০০ ০৩৬।

আমি বরুণ ভট্টাচার্য এতদ্দ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য।

১ এপ্রিল, ২০২৩

বরুণ ভট্টাচার্য
প্রকাশক
উৎস মানুষ

প্রতিবেদন

মেলায় আমরা

লিটল ম্যাগাজিন মেলা

১১ থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০১৩ রবীন্দ্রসদন —নন্দন প্রাঙ্গনে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি আয়োজিত সারা-বাংলা লিটল ম্যাগাজিন মেলায় প্রতিবারের মতো উৎস মানুষ অংশ নিয়েছিল। টেবিল-পিছু দুটি চেয়ার, পানীয় জল ও টিফিন-এর ব্যবস্থা করেছিলেন উদ্যোক্তারা। মুক্ত-মঞ্চ-র কাছেই টেবিল পাওয়াতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলো দেখার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। ব্যবস্থাপনা নিয়ে খুঁত ধরার অবকাশ ছিল না। মেলার পাঁচদিনই উদ্যোক্তাদের প্রতিনিধি এসে সুবিধে-অসুবিধে জানতে চেয়েছেন। এই মেলায় যোগ দিতে কোনো পয়সা লাগেনি। আগেও লাগত না। আমাদের যেটুকু বিক্রি হয়েছে তা যথেষ্ট।

আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা

পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ড আয়োজিত ৪৬তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা হয়ে গেল ৩১ জানুয়ারি থেকে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ বিধাননগর করুণাময়ী সেন্ট্রাল পার্কে। করণাময়ী বাস টার্মিনাম-এর সীমানা প্রাচীরের ধারে উৎস মানুষ স্টল পেয়েছিল। এবারে নতুন কোনো বই প্রকাশ করা যায় নি, তাই পুরনো পত্রিকা ও আমাদের প্রকাশনার বইগুলি নিয়ে স্টল সাজানো হয়েছিল। বাইরের প্রকাশনার কিছু নির্বাচিত বই তো প্রতিবারই থাকে, এবারও ছিল। পুরুলিয়ার আশাবরী প্রকাশনার কিছু বই এই প্রথম উৎস মানুষ স্টলে রাখা হয়েছিল। বিখ্যাত পরিবেশবিদ অনুপম মিশ্র-র বইগুলির ভাষান্তর করেছিলেন প্রয়াত নিরুপমা অধিকারী, যাঁকে অনেকেই 'পুরুলিয়ার জলদিদি' বলে জানেন। মেলার ব্যবস্থা কেমন ছিল? আন্তর্জাতিক বইমেলায় সুযোগ সুবিধে আন্তর্জাতিক মানের হওয়ার কথা। অথচ দুর্বল নেটওয়ার্ক-এর জন্য অনেক ক্রেতাই পছন্দের বই কিনতে পারেন নি। 'অনলাইন পেমেন্ট'-এর চটজলদি সুবিধে না পেয়ে ক্রেতা-বিক্রেতারা কিছুটা হতাশ হয়েছেন। আমাদের স্টলের দিকে আলোর ব্যবস্থা তেমন ছিল না। প্রতিবারই দেখা যায় উৎস মানুষ স্টলের লাগোয়া কোনো-না-কোনো ধর্মীয় সংস্থার স্টল থাকে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বিক্রি আশানুরূপ হয় নি। তার কারণ খোঁজার চেষ্টা করে কোনো লাভ নেই। ভিড় মানেই বেশি বই বিক্রি নয় তা আবার বোঝা গেল। হৈ-হুল্লোড়-এর সঙ্গে ফাস্টফুড-এর দোকানে লাইন—চেনা ছবি। তবে নতুন কিছুও দেখা গেল। জিনস আর টি-শার্ট পরা যুবক-যুবতী গল্পে মশগুল, একজনের টি-শার্টে লেখা 'ছোট ছিলাম ভাল ছিলাম' আর অন্যজনের টি-শার্টে লেখা 'ভাট বকিস না'—মানে বোঝার দরকার আছে কী?

কলেজ স্কোয়ারে লিটল ম্যাগাজিন মেলা

লিটল ম্যাগাজিন সমন্বয় কেন্দ্র আয়োজিত লিটল ম্যাগাজিনের মেলা ২৩ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩-এ কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে হয়ে গেল। ব্যবস্থাপনা মোটামুটি ভালই ছিল কিন্তু ওখানে ভিড়ও তেমন ছিল না, বিক্রিও তাই। মেলা চলেছে বেলা ৩ থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। সন্ধ্যের পর থেকেই চেয়ারে বসে হাই তোলা আর মশা তাড়ানো—এতেই ব্যস্ত থাকতে হত। সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠান যেমন প্রতিবারই হয় এবারও ছিল, কিন্তু মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় প্রশাসনের নির্দেশে মাইক বাজনোর অনুমতি ছিল না। উদ্যোক্তারা এই মেলার প্রচারের খামতির দিকটা ভেবে দেখলে ভাল হয়। মেলায় মানুষ না এলে মেলা জমবে কী করে? উ মা

উৎস মানুষ WB/EC 228 ISSN 0971-5800 RN. 37375/80 Rs. 30.00

৪৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা এপ্রিল-জুন ২০২৩ ৩০.০০ টাকা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইয়ের জন্য যোগাযোগ— সুমন্ত বিশ্বাস।
ফোন— ৯৪৩৩৭৭১৫৭৭/৯১৪৩৭৮৬১৩৪

উৎস মানুষ পত্রিকা ও প্রকাশনার বইগুলি অনলাইনে অর্ডার দিলে পাওয়া যায়। যোগাযোগ—হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**
হারিতের ফোন নং — ৯১ ৮৩৩৬৯৪১১০৮

গ্রাহক চাঁদা (বাৎসরিক) ১৫০ টাকা (চারটি সংখ্যার জন্য) উৎস মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া যায়। স্পিড পোস্টে নিলে ২২০ টাকা জমা দিতে হবে।

Punjab National Bank,
College Street Branch,
Kolkata - 700073.
UTSA MANUSH, SB ACCOUNT NO. 0083010748838. IFSC NO. PUNB0058400

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে ফোনে বা ই-মেলে নাম, ঠিকানা, পিনকোড, ফোন নং ও ই-মেল দেবেন আর কোন সংখ্যা থেকে গ্রাহক হবেন তা জানাবেন। সাধারণ ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয়। ডাকে পত্রিকা না পেলে আমরা সংখ্যাটি দ্বিতীয়বার পাঠাতে পারব না। গ্রাহক নবীকরণ একইভাবে করা করা হয়।

ওয়েবসাইট : **https://www.utsomanush.com**
ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**
Facebook : https://www.facebook.com/

পুস্তক তালিকা

স্বাস্থ্যের সাতকাহন : গৌতম মিস্ত্রী	২৫০.০০
আসুন কাণ্ডজ্ঞানে ফিরি: আশীষ লাহিড়ী	৮০.০০
চেনা বিষয় অচেনা জগৎ: সমীরকুমার ঘোষ	১৫০.০০
বাঁধ বন্যা বিপর্যয় (সংকলন)	২০০.০০
আহরণ (সংকলন)	২০০.০০
যে গল্পের শেষ নেই: দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	১৫০.০০
প্রতিরোধ : সম্পা: (ঐ)	১০০.০০
বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (সংকলন)	২০০.০০
বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (সংকলন)	১৫০.০০
বিবেকানন্দ অন্য চোখে/সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	
নিরঞ্জন ধর	১২০.০০
প্রমিথিউসের পথে (সংকলন)	৫০.০০
লেখালিখি: অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২০০.০০
যুক্তিবাদের চার সেনাপতি	
অনু : প্রতুল মুখোপাধ্যায়	৬০.০০
শেকল ভাঙা সংস্কৃতি (সংকলন)	১২০.০০
গুমোট ভাঙ্গার গান: ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ	১৫০.০০
নিজের মুখোমুখি: রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	৫০.০০
এটা কী ওটা কেন (সংকলন)	৫০.০০
মূল্যবোধ (সংকলন)	৮০.০০
প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ:	
অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	৩০.০০
তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক:	
রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু:	
হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০

প্রাপ্তিস্থান : বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা, দুপুর ৩টে-সন্ধ্যে ৭টা), পাতিরাম, বুকমার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট), ক্রান্তিক (কলেজ স্ট্রীট), রথীনদা (গোলপার্ক). ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (সূর্য সেন স্ট্রীট) । জ্ঞান বিচিত্রা ১৮বি/১বি, টেমার লেন। সেতু প্রকাশনী ২ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,কল-৭৩ (কফি হাউসের পাশের গলি)। হারিত বুকস (অনলাইন) **haritbooks@gmail.com**

উৎস মানুষ সোসাইটির পক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং দি নিউ জয়কালী প্রেস, ৮এ, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা- ৭০০ ০০৬ হইতে মুদ্রিত।

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/